তিন গোয়েন্দা
বাঁশিরহস্য
রকিব হাসান
বিচিত্র এক রহস্যের সমাধান করতে স্কটল্যান্ডে চলল
তিন গোয়েন্দা।
প্রচণ্ড ঝড়ে উল্টে গেল হাউসবোট।
রাতদুপুরে পাহাড়ের মাথায় ব্যাগপাইপ বাজে ফিসফিসানি স্বরে।
জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল রহস্য।
ঘাবড়ে গেল মুসা। বলল, ভূত!
কিশোর বলল, ভূত না কচু।
ওসব বিশ্বাস করি না আমি।
সব মানুষের শয়তানি।
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
বাঁশিরহস্য
রকিব হাসান

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

বাঁশিরহস্য

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

'এই, কিশোর, স্কটল্যান্ড যাবি নাকি?' নাস্তার টেবিলে বোম ফাটালেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। 'একটা রহস্যের সমাধান করতে? খুব দামী একটা জিনিস তোর চাচীকে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ওটা হারিয়ে গেছে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর। 'চাচীকে? কি জিনিস? কে পাঠাত?'

'তোর চাচীর এক দূর সম্পর্কের মামী। লর্ডের স্ত্রী। লেডি ওয়াগনার। তোর চাচীকে খুব স্নেহ করেন।'

'কই, কখনও শুনিনি তো তাঁর নাম?'

'শুনবি কি করে?' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'ছোটবেলায় তাঁর কাছে গিয়ে বেড়াতাম। তোর চাচার সঙ্গে বিয়ের পর আর যাইনি।'

কিশোর জানল, লেডি ওয়াগনার ইনভারনেস-শায়ারে থাকেন। কয়েক দিন আগে রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি আর সহায় সম্পত্তি ন্যাশনাল ট্রাস্ট অভ স্কটল্যান্ডকে দান করে দিতে চাইছেন। ন্যাশনাল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানটার কাজ পুরানো প্রাসাদ, ধ্বংসাবশেষ বা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এমন জায়গা-জমি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

'কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের লিখিত অনুমতি ছাড়া মিসেস ডগলাসের সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্ভব নয়,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'লেডি ওয়াগনার আমেরিকায় তাঁর রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে লিখিত অনুমতি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। কেসটার ব্যাপারে আরও খোলাসা করে জানার জন্যে আমাকে একবার স্কটল্যান্ডে যেতে হবে।'

'দামী জিনিস যেটা চাচীকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি···' কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। বাধা দিল টেলিফোন। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল সে। 'কে?'

'দেখে আয়,' চাচা বললেন।

ফোন করেছে টম, টমাস মার্টিন। তিন গোয়েন্দার বন্ধু। অনেক কেসে ওদেরকে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ আমেরিকা সবে সফর করে এসেছে সে। সে-খবরটা জানানোর জন্যেই ফোন করেছে।

'তা চলে এসো না,' খুশি হলো কিশোর। 'রাতে আমাদের এখানেই খেও। খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমার কাছেও কিন্তু একটা চমকে দেয়ার মত খবর আছে। আমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি! হঠাৎ স্কটল্যান্ডে কেন?'

'এসো, সব বলব,' কিশোর বলল।

'আসছি। সাতটার মধ্যে,' ফোন ছেড়ে দিল টম।

ড্রইংরুমে ঢুকল কিশোর। জানাল টম ফোন করেছিল। চাচার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, তারপর? জিনিসটা কি যেটা হারিয়ে গেছে?'

হাসলেন রাশেদ পাশা। 'এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু লেখেননি। হয়তো জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। শুধু জানিয়েছেন হারিয়ে গেছে জিনিসটা।'

'বাড়ি থেকে হারিয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না।'

'চুরি হয়ে গেছে?'

'তা-ও জানি না। হতে পারে।'

'এত কথা না বলে চলে যা না,' স্কুল তো ছুটিই,' মেরিচাচী বললেন। 'স্কটল্যান্ডও দেখা হবে, মামীর সঙ্গেও দেখা হবে, রহস্যটারও সমাধান করতে পারবি।'

'যাব তো বটেই।' চাচার দিকে তাকাল কিশোর। 'স্কটল্যান্ডের কোনখানে যাবে তুমি?'

'এডিনবার্গ সহ বেশ কয়েক জায়গায়। তবে প্রথমে নিউ ইয়র্ক যাব। লেডি ওয়াগনারের আত্মীয়-স্বজনরা সব ওখানেই থাকেন। সবশেষে যাব লেডি ডগলাসের বাড়িতে।'

'গেলে মজাই হবে বুঝতে পারছি,' উত্তেজনা চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'ওখানে আর কখনও গেছ?'

'একবার গিয়েছিলাম,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'খুব সুন্দর বাড়ি। ওরকম একটা বাড়ি পেলে ন্যাশনাল ট্রাস্ট খুশিই হবে। কারণ ওয়াগনার হাউসে দেখার মত অনেক কিছু আছে।'

হাতে কাজ আছে। যাবার আগে সেরে রেখে যেতে হবে। সোজা অফিসে গিয়ে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচী চলে গেলেন চুলার কাছে।

মুসা আর রবিনকে ফোন করার কথা ভাবছে কিশোর, এ সময় কলিং বেল বাজল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। 'ও, এসে পড়েছ। এসো।'

হাসিমুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে টম। 'হাই,' কিশোরকে দেখে হাসিটা চওড়া হলো তার। 'আমার গাড়িটা গেটের বাইরে। তোমাদেরটার জন্যে ঢোকাতে পারলাম না। গেট আটকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন?'

'চাকা লিক,' কিশোর বলল। 'রোভার বোধহয় ওঅর্কশপে বসে সারাচ্ছে। চাকা লাগিয়ে তারপর ভেতরে ঢোকাবে। থাক তোমার গাড়ি ওটার পেছনে। কিছু হবে না।'

ঘরে ঢুকল টম। লিভিংরুমে বসে গল্প শুরু করল দু'জনে। দক্ষিণ আমেরিকা সফরের গল্প বলতে লাগল টম। শেষে স্কটল্যান্ডের কথা উঠল। টম বলল, 'স্কটল্যান্ডে যখন যাচ্ছই, আরেকটা রহস্যের খবর জানাতে পারি।'

'কি রহস্য? কার কাছে শুনলে?'

'পত্রিকায় পড়লাম। স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড থেকে নাকি বিপুল পরিমাণে ভেড়া

চুরি হচ্ছে। প্রশাসন শত চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারছে না।'

'অ, ওটা। আমিও পড়েছি। যাক, মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ। হাতের কাছে রহস্য পেলে ছাড়ে কে।'

'কদ্দিন থাকবে ওখানে?'

'জানি না। চাচা বলেনি আমাকে। চাচা নিজেও হয়তো জানে না ক'দিন থাকা লাগবে।'

'কিন্তু আমার জন্মদিনটা। তোমাদের ছাড়া তো পার্টিই জমবে না।'

'দেখা যাক। দেরি আছে তো। ততদিনে হয়তো ফিরে চলে আসব। রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারলে আমরা তিনজন অন্তত থাকব না, আমি, রবিন আর মুসা। কথা দিলাম, যাও। চাচা থাকে থাকুকগে।'

খুশি হলো টম। পকেট থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার জন্যে। দক্ষিণ আমেরিকার স্যুভনির।'

প্যাকেটটা খুলল কিশোর। কাঠের তৈরি চমৎকার একটা জাগুয়ারের মূর্তি। চোখে পাথর বসানো। এত নিখুঁত রঙ করা, জীবন্ত মনে হয়।

'দারুণ তো!' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। 'থ্যাংক ইউ।'

'যেখান থেকে কিনেছি, দোকানদার বলল জাগুয়ারের এই মূর্তি নাকি সৌভাগ্যের প্রতীক। যার কাছে থাকবে তার ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।'

'কেমন সৌভাগ্য বয়ে আনে, স্কটল্যান্ড গেলেই বুঝতে পারব,' হাসল কিশোর। 'দু'দুটো রহস্য সামাধানের জন্যে সত্যিই ভাগ্যের সহায়তার প্রয়োজন হবে আমার।'

খাবার টেবিলে দিয়ে ডাক দিলেন মেরিচাচী। খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। ফোন ধরল কিশোর। ওধার থেকে মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিশোর? কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব! তোমার জন্যে একটা পুরস্কার জিতলাম।'

'আমার জন্যে মানে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।

'ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার ফটো প্রতিযোগিতায় তোমার একটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম,' মুসা বলল। 'তোমাকে জানাইনি। ভেবেছিলাম জিতলে চমকে দেব।'

'সত্যিই চমকে দিলে! করেছ কি।'

'খারাপটা কি করলাম? সেদিন তুমি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করার সময় যে একটা ছবি তুলেছিলাম মনে আছে? সেটাই পাঠিয়েছিলাম পত্রিকায়। সাংঘাতিক জিতা জিতেছি। একেবারে প্রথম পুরস্কার। ভ্রমণ পুরস্কার, পৃথিবীর যে কোন দেশে যাবার খরচ জোগাবে আমাকে ওরা। সঙ্গী হিসেবে একজনকে নেয়া যাবে। তোমার জন্যেই পুরস্কার জিতেছি। ঠিক করেছি যেখানেই যাই তোমাকে নিয়ে যাব,' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল মুসা।

কিন্তু প্রিয় বন্ধুর পুরস্কার জেতার খবরে খুশি হতে পারল না কিশোর। ধপ করে ফোনের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। পাবলিসিটি মোটেও পছন্দ করে না

সে। আর মুসার পুরস্কার জেতার কারণে এখন পাবলিসিটির হাঙ্গামা পোহাতে হবে তাকে। মহা উৎসাহে আবার শুরু করল মুসা। 'সারা পৃথিবীতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে, কিশোর। খবরের কাগজে আর পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হবে তোমার নাম।'

হতাশ বোধ করছে কিশোর। স্কটল্যান্ডে গিয়ে গোপনে রহস্য ভেদ করা আর বুঝি হলো না। 'আমাকে হয়তো ছদ্মবেশ নিয়েই যেতে হবে,' মনে মনে ভাবল ও।

অনেকক্ষণ কিশোরের সাড়া না পেয়ে প্রশ্ন করল মুসা, 'কি হয়েছে কিশোর? তুমি আছো তো লাইনে···,'

হঠাৎ রাস্তায় তীব্র একটা সংঘর্ষের শব্দ হলো। বাড়ির ঠিক বাইরে থেকে আওয়াজটা এসেছে।

'মুসা, একটু ধরো,' বলে টেবিলে ফোন রেখে হলঘরের দিকে ছুটল কিশোর।

দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর আর টম। ভয়ানক একটা দৃশ্য দেখতে পেল। পুরানো, পাঁচটনি একটা ট্রাক গুঁতো মেরে দুমড়ে দিয়েছে ইয়ার্ডের গাড়িটাকে, যেটার চাকা লিক হয়েছিল। ওটার পেছনে ছিল টমের গাড়ি। ওটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ট্রাকটার ড্রাইভারের জন্যে চারপাশে তাকাতে শুরু করল কিশোর।

দুই

ইয়ার্ডের ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়িটার সামনে এসে এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বুজে ফেলল কিশোর। ভীষণ কষ্ট লাগছে তার। গাড়িটা ভাল ছিল। সে নিজেও চালিয়েছে বহুবার। ভয় পাচ্ছে নিদারুণ আরও কি দৃশ্য দেখতে হয় ভেবে। ট্রাক ড্রাইভারের জখম হওয়ার কথাই ভাবছে সে।

টম উঁকি দিল ট্রাকের মধ্যে। অবাক গলায় বলল, 'আরে কেউ তো নেই ভেতরে।'

কিশোর লক্ষ করল ট্রাকের দরজা খোলা। ড্রাইভার ঝাঁকির চোটে দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ে যেতে পারে। দ্রুত একবার রাস্তায় চক্কর মেরে এল কিশোর। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

'টম, কাউকে পালিয়ে যেতে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টম। দেখেনি।

ভাঙাচোরা গাড়ি আর ট্রাক আবার পরীক্ষা করে দেখল ওরা। নাহ্। দোমড়ানো ধাতবখণ্ডের মাঝে কেউ চাপা পড়ে নেই।

'আমার ধারণা, কিশোর বলল, 'গুঁতো মেরেই দরজা খুলে পালিয়েছে ড্রাইভার। ট্রাকের তেমন কিছুই হয়নি দেখছ না।'

দাঁতে দাঁত ঘষল টম। 'ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে।'

'কিন্তু কেন করল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা কে জানে!' ট্রাকের পিছন দিকটা দেখে এল টম। 'লাইসেন্স প্লেট নেই। তারমানে চুরি করে এনেছিল ট্রাকটা। প্লেট খুলে ফেলে দিয়েছে।'

'ইঞ্জিন নম্বরটা দেখবে?' অনুরোধ করল কিশোর। 'নম্বর দেখে হয়তো ধরতে পারব ওকে। তুমি দাঁড়াও। আমি টর্চ নিয়ে আসি।'

একটু পরে প্রতিবেশীরা ভিড় জমাতে শুরু করল। ইয়ার্ডের গাড়ির ওপর ট্রাক চড়াও হতে দেখে তারা সবাই স্তম্ভিত। রাশেদ পাশাও বেরিয়ে এলেন।

কিশোর আর টম ইঞ্জিন নম্বর খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। নম্বরটার সন্ধান মিললেও সংখ্যাগুলো চেনা গেল না। সুকৌশলে কেউ আঁচড়ে তুলে ফেলেছে, পড়া যায় না।

'এখন পরিষ্কার, অ্যাক্সিডেন্টটা কেউ ইচ্ছে করেই করেছে,' কিশোর বলল ওর চাচাকে। 'কিন্তু এ কাজ কে এবং কেন করবে মাথায় ঢুকছে না আমার।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রাশেদ পাশার, 'ঘটনা যেই ঘটাক তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয় আমার কাছেও। তবে তোকে বা টমকে আহত করতে চায়নি সে। তাই খালি গাড়িটাকে চাপা দিয়ে পালিয়েছে।'

মেরিচাচী পুলিশে খবর দিলেন। প্রতিবেশীরা টমের গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখল। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি টমের গাড়ির। হেড লাইট দুটো ভেঙেছে আর ফেন্ডার বেঁকে গেছে।

ট্রাক ড্রাইভার এবং তার মালিকের পরিচয়ের খোঁজে বৃথাই অনুসন্ধান চালানো হলো। ট্রাকের কোথাও তার নাম লেখা নেই, কোন কাগজপত্রও চোখে পড়ল না।

'ট্রাকের ভেতরটা দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'না। দেখিনি,' জবাব দিল কিশোর।

টর্চ নিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠে এল সে। মেঝেতে বা সাইডগুলোতে কিছু নেই। যে বা যারাই কাণ্ডটা ঘটিয়ে থাকুক, সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে আগেভাগে।

একটু পরেই এল পুলিশের গাড়ি, সেই সঙ্গে দুটো রেকার। কিশোরের ভাঙা গাড়ি আর ট্রাকের ছবি তুলল পুলিশ, একজন ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট হুইল এবং দরজার হাতল পরীক্ষা করে দেখল। ওগুলোতে অনেকের আঙুলের ছাপ রয়েছে।

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে কিশোরদের কাছে দাঁড়াল। জানতে চাইল অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করে কিনা ওরা।

'কে কাজটা করতে পারে সে-ব্যাপারে কোন ধারণা নেই আমাদের,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

রেকার দুটো কিশোরের গাড়ি আর ট্রাক টেনে নিয়ে চলে গেল। টম টর্চ জ্বেলে ওর গাড়ির দশা দেখল। বলল, 'গ্যারেজে নিতে হবে গাড়িটাকে। হেড লাইট লাগাতে হবে,' গাড়িতে চড়ে বসল ও। 'কিশোর, পুলিশ এই অ্যাক্সিডেন্ট রহস্যের সমাধান করতে না পারলে আমি চেষ্টা করে দেখব একবার?'

'দেখতে পারো,' কিশোর বলল।

'পুলিশ কোনও খোঁজ পেল কিনা জানাতে কাল ফোন করব তোমাকে,' গাড়িতে স্টার্ট দিল টম। চলে গেল। পড়শীরাও একে একে ফিরে গেল যে যার বাড়িতে।

কিশোরকে নিয়ে তার চাচা ঘরে ঢুকলেন। ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কিশোর, 'মুসা! আরে ওতো ফোন ধরে আছে।'

কিশোর ভেবেছিল দেরি দেখে হয়তো ফোন ছেড়ে দিয়েছে মুসা। ছাড়েনি। অভিযোগের সুরে বলল, 'কি ব্যাপার? অনন্তকাল ধরে ফোন ধরে আছি! হাত ব্যথা হয়ে গেছে।'

'সরি, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার কথা। কেন ভুলেছি, বললেই বুঝতে পারবে।'

সমস্ত ঘটনা মুসাকে খুলে বলল কিশোর।

শুনে আঁতকে উঠল মুসা। 'কি ভয়ঙ্কর লোক! ধরতে পারবে তো পুলিশ?'

'জানি না,' কিশোর বলল। 'থাকগে, বাদ দাও ওদের কথা। তোমার কথা বলো। কোথায় যেন যাবার কথা বলছিলে?'

মুসা আবার বলল পুরস্কার জেতার কথা। যে কোন একজন সঙ্গী নিয়ে ইউরোপের যে কোনও দেশে বেড়াতে যাওয়ার খরচ পাবে সে।

'রবিনকে নিয়ে যাও না,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আমি চাচার সঙ্গে স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি। জোড়া রহস্যের সমাধান করতে। কিংবা আরেক কাজ করতে পারো। দু'জনের খরচ যখন পাবেই, তোমরাও চলো আমাদের সঙ্গে। তাহলে খুব মজা হবে।'

'বলছ যেতে?'

'বলছি।'

'ঠিক আছে,' খুশি হলো মুসা। 'আমি এখুনি ফোন করছি রবিনকে। দেখি ও যেতে রাজি হয় কিনা।'

দশ মিনিট পরে আবার কিশোরকে ফোন করল মুসা। 'রবিন যেতে রাজি হয়েছে। বলল একসঙ্গে তিনজনে গেলে মজাই হবে। কবে যাবে তোমরা? রাশেদ আঙ্কেল কি রিজার্ভেশন করতে পারবেন আমাদের জন্যে?'

চাচাকে জিজ্ঞেস করতে গেল কিশোর।

'তিন দিন পরে রওনা হব আমরা,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'ওদের বলো রিজার্ভেশনের কোন সমস্যা হবে না।'

কিশোর খবরটা দিল মুসাকে।

মুসা মহাখুশি। বলল, 'তিন দিন পরে? খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যায় অবশ্য। তবে পাসপোর্ট রেডি আছে। যেতে পারব।'

পরদিন সকাল। রাশেদ পাশা বেরিয়ে গেছেন তাঁর কাজে। নাস্তা সেরে সবে উঠেছে কিশোর, এমন সময় পোস্টম্যান এল চিঠি নিয়ে। একটা প্যাকেট দিয়ে চলে গেল সে।

খামের ওপর প্রেরকের নাম-ঠিকানা লেখা নেই। কৌতূহলী হয়ে খামটা খুলল কিশোর। ভেতরে একটা চিরকুট। পড়তে পড়তে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল তার। মেরিচাচী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'কি রে, খারাপ কিছু নাকি?'

'হ্যাঁ। হুমকি দিয়েছে আমাকে।'

'মানে!' ভুরু কুঁচকে গেল চাচীর। কিশোরের কাছ থেকে কাগজের টুকরোটা.

নিয়ে জোরে জোরে পড়লেন, 'তোমাদের গাড়িটা ভর্তা করে দেয়ার মত অ্যাক্সিডেন্ট আরও ঘটাব। এটা কেবল শুরু।'

চিঠির নিচে কোন দস্তখত নেই।

টিপেটুপে দেখল কিশোর। খামের মধ্যে আরও কিছু আছে। হাত ঢুকিয়ে চৌকোনা, পশমী এক টুকরো কাপড় বের করে আনল। 'এটা ওয়াগনারদের কাপড়,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'মানে!' অবাক হলেন মেরিচাচী।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কিছু ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'আমার ধারণা, যে এই চিঠিটা লিখেছে সে চাইছে না আমি স্কটল্যান্ডে যাই। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের সাথে আমার আসন্ন স্কটল্যান্ড যাত্রার একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। হারানো জিনিসটার ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। যে এ চিঠি লিখেছে সে-ই বোধহয় জিনিসটাও চুরি করেছে। এবং সে চায় না আমি ওটা খুঁজে বের করি।'

'কিন্তু খামে তো রকি বীচের ডাকঘরের চিহ্ন,' মেরিচাচী বললেন।

কপালে ভাঁজ পড়ল কিশোরের। চিন্তিত গলায় বলল, 'হয়তো মূল্যবান জিনিসটা এখানেই পাচার করে দেয়া হয়েছে। যাকগে আমি চিঠিটা পুলিশকে দেব।'

কিশোর বেনামী চিঠিটা পুলিশকে দিয়ে এল। পুলিশ এখনও ট্রাক ড্রাইভারের হদিস বের করতে পারেনি।

বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করল কিশোর। বাজার থেকে এসে গাড়ি মেকানিকের সঙ্গে কথা বলল। অটোমোবাইল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করল। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গাড়িটা মেরামত করা যাবে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সময় লাগবে মেরামত করতে। তা লাগুক। আপাতত কোন তাড়াহুড়া নেই ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় কিশোর আর মেরিচাচী বেরোলেন খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসতে, সঙ্গে একটা কুকুর। ওটাকে জোগাড় করে এনেছেন রাশেদ পাশা। পুরানো বাড়িতে পুরানো মাল কিনতে গিয়ে বেওয়ারিশ একটা খুদে টেরিয়ার কুকুরকে অসহায় হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। কুকুরটার নাম রেখেছেন ডোরা। ডোরাকে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে কিশোর আর মেরিচাচী, রাশেদ পাশা তাঁর অফিসে হিসেব দেখছেন।

ঘণ্টাখানেক ডোরাকে নিয়ে দৌড়াল কিশোর আর মেরিচাচী। হাঁপিয়ে গেছে দু'জনই। ডোরাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। ড্রাইভওয়ের কাছাকাছি এসেছে, দেখল একটা লোক ওদের বাড়ির সামনে থেকে চোরের মত বেরিয়ে আসছে। মোড় ঘুরে পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিশোর ডোরাকে নিয়ে ছুটল লোকটাকে ধরতে। কিন্তু বাড়ির পেছনের উঠোনে এসে দেখল নেই লোকটা। চলে গেছে।

মেরিচাচী মন্তব্য করলেন, 'ব্যাটার ভাবগতিক কিন্তু সুবিধের মনে হয়নি আমার।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল কিশোর। 'লোকটা কি উদ্দেশে এসেছিল জানা দরকার।'

ডোরাকে বাসায় রেখে হলঘরের টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে এল কিশোর। আলো জ্বেলে দেখল সিঁড়ি থেকে সামনের বারান্দা পর্যন্ত হালকা, কাদামাখা পায়ের ছাপ চলে গেছে। ছাপগুলো লক্ষ্য করে পা বাড়িয়েছে কিশোর, চেঁচিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'আমাদের চিঠির বাক্সে কি যেন টিকটিক শব্দ করছে!'

চট করে ঘুরল কিশোর, তাকাল সদর দরজার হুকের সঙ্গে আটকানো লোহার ডাকবাক্সের দিকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার।

'বোমা!' আঁতকে উঠল কিশোর।

তিন

হুক থেকে ডাকবাক্সটা খুলে আনতে পা বাড়িয়েছে কিশোর, বাধা দিলেন মেরিচাচী। 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, খবরদার!'

'টিকটিক শব্দ সবে শুরু হয়েছে,' কিশোর বলল। 'এখুনি ফাটবে না নিশ্চয়।' একটানে হুক থেকে ডাকবাক্সটা ছুটিয়ে আনল সে। তারপর ছুঁড়ে মারল বাগানের দিকে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। বোমাটা বিস্ফোরিত হবার অপেক্ষা করছে। পাঁচ বার টিকটিক শব্দ হয়েছে। ছয়-সাত-আট-নয়···

বুম!

বিস্ফোরণের চোটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বাক্সটা, মাটিতে তৈরি করল গভীর গর্ত। মাটি আর পাথর ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

বিস্ফোরণের শব্দে দৌড়ে এলেন রাশেদ পাশা। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মেরিচাচী। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কিশোরই ব্যাখ্যা করল ঘটনাটা।

সব শুনে অদৃশ্য হামলাকারীর ওপর খুব রাগ হলো রাশেদ পাশার। 'তোরা আরেকটু হলে মারা যেতে পারতিস। নাহ্ আর সহ্য করা যায় না। এ সবের হোতাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

পুলিশে ফোন করার জন্যে ঘরে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। কিশোর বাগানে গেল। তার অনুসন্ধানী চোখ আটকে গেল কতগুলো টুকরো কাগজের ওপর। ডাকবাক্সে চিঠি থাকার কথা নয়। কারণ বিকেলেই ওগুলো বের করে নেয়া হয়েছে। তাহলে এ কাগজগুলো এল কোত্থেকে? টুকরোগুলো একত্র করল কিশোর। মেরিচাচীকে দেখিয়ে বলল, 'এটা চিঠি হতে পারে। কিন্তু চিঠিটা রেখে গেল কে? তোমার কি মনে হয়, চাচী?

ভুরু কুঁচকে গেল মেরিচাচীর। 'আজ ডিনারের ঠিক আগে আগে কলিংবেল বেজে উঠেছিল। আমি দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। তোর কি মনে হয় এ চিঠিটা

ওই লোকই আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। ছেঁড়া কাগজগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল ও, ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর সাজাল টুকরোগুলো। কয়েকটা শব্দ নেই, তবু মোটামুটি একটা অর্থ দাঁড় করাতে পারল কিশোর। লেখাটা বোধহয় ছিল: সাবধান হও কিশোর পাশা। নইলে পেইশা তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

চোখ বড় বড় করে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। কে পাঠিয়েছে এটা? আর পেইশাটাই বা কে? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

রাশেদ পাশা মেরিচাচীকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। জানালেন দু'জন পুলিশ এসেছে। হামলাকারীর ফুটপ্রিন্ট সংগ্রহ করছে। তাদেরকে ছেঁড়া মেসেজটা দেখাল কিশোর।

মেরিচাচী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'তোরা স্কটল্যান্ড যাচ্ছিস ভালই হচ্ছে। এ জায়গা আপাতত তোদের জন্যে নিরাপদ নয়।'

কিশোর বলল, 'আমার অজানা একজন শত্রু যেমন আছে তেমনি একজন অচেনা বন্ধুও আছে। এ চিঠিটা সেই বন্ধুই লিখেছে। আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। হাতের লেখাটা লক্ষ করো। মেয়েদের হাতের লেখার মত লাগছে না?'

'তা লাগছে,' সায় দিলেন রাশেদ পাশা। 'তবে তোর অজানা শত্রু আড়ালে থেকে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতেই ভালবাসে। আবার কখন আক্রমণ করে বসে কে জানে।'

ওরা কথা বলছে, বেজে উঠল সদর দরজার কলিংবেল। রকি বীচ পুলিশ ফোর্সের চীফ ক্যাপ্টেন ইয়াং ফ্লেচার এসেছেন।

ডাইনিং রুমে চলে এলেন ক্যাপ্টেন। কুশল বিনিময়ের পরে বললেন, 'পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে শুনতে চাই আমি। শুরু করো, কিশোর।'

ঘটনাটা ওকে খুলে কিশোর বলল, চিঠিটাও দেখাল।

শিস দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'কিশোর, দেখো তো আঠা দিয়ে জোড়া দিতে পারো নাকি।'

কিশোর কার্ডবোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে ছেঁড়া কাগজগুলো লাগাল। কাজটা কঠিন এবং ক্লান্তিকর। এদিকে পুলিশের লোকজন বাড়ির বাইরে অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিল চীফকে। তারপর চলে গেল তারা।

কিশোর অদ্ভুত চিঠির রহস্য খুঁজে বের করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে লেখাটা একটা ট্রেসিং পেপারে তুলল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'শুনলাম তুমি স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যাচ্ছ। এ চিঠির লেখকের পরিচয় বের করতে চাইলে আরও তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।

মুচকি হাসল কিশোর। 'দেখা যাক পারি কি না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

পরদিন সকালে কিশোর তার চাচাকে বলল সে কয়েকজন দোকানীর সঙ্গে কথা বলবে। কোন স্কটিশ খদ্দেরকে তারা দেখেছে কিনা জানা দরকার। 'স্কটিশ কেউ এ ধরনের পশমী কাপড় পাঠিয়ে দিতে পারে,' বলল সে।

'দেখ চেষ্টা করে,' রাশেদ পাশা বললেন।

বেশ কয়েকটা দোকানে খোঁজ নিল কিশোর। ইতিবাচক জবাব পেল না কোনখান থেকে। মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে কিশোর, চোখ আটকে গেল একটা ফটো তোলার দোকানের ওপর। দোকানের কাঁচের গায়ে সাঁটা একটা ছবি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছবিটা ওর নিজের।

দোকানের সামনে চলে এল কিশোর। দোকানের ডিসপ্লেতে ঝুলছে ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটা কপি। প্রচ্ছদে কিশোরকে দেখা যাচ্ছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কিছু পরীক্ষা করছে। কখন যে ওকে ঘিরে ভিড় জমে উঠেছে খেয়াল করেনি কিশোর। ছবিটা থেকে মুখ ফেরাল সে। যাবার জন্যে ঘুরল। এমন সময় ভিড় থেকে হর্ষধ্বনি উঠল, তালি বাজাতে শুরু করেছে জনতা। তালির শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল পথচারীরা। ঘটনা কি দেখার জন্যে তারাও ভিড় জমাল দোকানের সামনে।

'তুমি···তুমি সত্যি কিশোর পাশা!' ভিড় থেকে রিনরিনে কণ্ঠে জানতে চাইল একটা বাচ্চা মেয়ে। 'আমি তোমার ভীষণ ভক্ত!'

'তুমিই সেই দুর্দান্ত কিশোর গোয়েন্দা, তাই না!' চেঁচিয়ে উঠল আরেক কিশোরী। 'জটিল জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ, পুলিশ যেগুলোর কিনারা করতে পারেনি। তুমি একটা জিনিয়াস!'

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটা ছেলে। অনুরোধ করল, 'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ!' ছেলেটার পরনে শতছিন্ন পোশাক। বোঝাই যায় খুব গরীব। বড় বড় নীল চোখে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, খুব মায়া হলো কিশোরের। ছেলেটার বাড়িয়ে দেয়া কাগজে নিজের নাম সই করে দিল সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' হাসল ছেলেটা, পরক্ষণে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

দৌড়ে এল সেই বাচ্চা মেয়েটা। 'ইস্, কেন যে আজ কাগজ-কলম নিয়ে বেরোলাম না!'

হাসল কিশোর। হাতব্যাগ খুলে ছোট একটা নোট বই বের করল। একটা পৃষ্ঠায় নিজের নাম সই করে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিল।

বাচ্চাটাকে অটোগ্রাফ দেয়ার পরে মুশকিলেই পড়ে গেল কিশোর। সবাই এখন অটোগ্রাফ চাইছে। বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দিল ও হাসিমুখে, কিন্তু বড়দের এগিয়ে আসতে দেখে বাধা দিল হাত তুলে।

'দুঃখিত,' বিনীত স্বরে কিশোর বলল 'আমি শুধু বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দেব।'

কথা বলতে বলতে লক্ষ করল কিশোর ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেটা এখনও যায়নি। দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের পেছনে। বিরক্ত হয়ে দেখল ওর অটোগ্রাফটা একটা লোককে দিয়ে দিচ্ছে ছেলেটা। বিনিময়ে লোকটা তাকে টাকা দিল।

'কি বুদ্ধি!' মনে মনে ভাবল কিশোর। জোর গলায় লোকটাকে ডাকল 'এই যে, মিস্টার। আগেই বলেছি আমি শুধু বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দেব। ওই কাগজটা আমাকে দিয়ে দিন।'

জবাবে মুখ বাঁকিয়ে হাসল লোকটা। 'ধন্যবাদ, খোকা। তোমার অটোগ্রাফ আমার খুব কাজে লাগবে,' বলে হনহন করে রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করে দিল সে।

খুব রাগ হলো কিশোরের। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে। মনে হচ্ছে

লোকটার মতলব ভাল নয়। অটোগ্রাফটা তাকে ফেরত পেতেই হবে।

লোকজনকে ধাক্কা মেরে, ভিড় ঠেলে এগোল কিশোর। দৌড় দিল। লোকটা ওকে পিছু নিতে দেখে চট করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিশোর গলি মুখে এসে দেখল নেই লোকটা। হতাশ হয়ে ফিরে চলল ও।

মেইন স্ট্রীটে এসে হাঁপ ছাড়ল কিশোর। চলে গেছে অটোগ্রাফ শিকারীরা। শুধু ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেটা আছে যে একটু আগে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে তার অটোগ্রাফ।

কিশোরকে দেখে ছেলেটা আবার দৌড়ে এল। 'আরেকটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ?'

গরীব বলে ছেলেটার জন্যে মায়া হয়েছিল কিশোরের, এখন মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বিক্রি করার জন্যে?'

থতমত খেয়ে গেল ছেলেটা। আমতা-আমতা করে বলল, 'ন্-না। এবার সত্যিই আমার জন্যে।'

'যার কাছে আমার অটোগ্রাফ বিক্রি করেছ কে লোকটা?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ছেলেটার চেহারা। 'আ-আমি জানি না। বিশ্বাস করো। তুমি যখন বললে বড়দেরকে অটোগ্রাফ দেবে না ওই সময় লোকটা তোমার অটোগ্রাফ কেনার জন্যে আমাকে দশ ডলার দিতে চাইল। আমি লোভ সামলাতে পারিনি। আমার মা খুব অসুস্থ। আমি…,' ফোঁপাতে শুরু করল সে।

ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরেছিল কিশোর শক্ত হাতে। ও সত্য কথা বলছে বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল। পার্স থেকে নোট বই বের করল। 'তোমাকে আমার অটোগ্রাফ দিয়েছি। এবার তুমি আমাকে দেবে। তোমার নাম ঠিকানা লিখে দাও এখানে।'

ছেলেটা আনন্দের সঙ্গে করল কাজটা। নোট বইটা ওর হাত থেকে নিয়ে কিশোর বলল, 'কিটি রোভার, আমি একদিন তোমাদের বাসায় যাব। দেখব সত্যি কথা বলেছ কিনা। তখন আরেকটা অটোগ্রাফ দেব,' ছেলেটার কাঁধ চাপড়ে দিল ও হাসিমুখে। 'ঠিক আছে?'

জবাবে হাসল ছেলেটাও। 'সরি!' বলে চলে গেল সে।

কিশোর একবার ভাবল পিছু নেবে ছেলেটার। সন্দেহ হচ্ছে ছেলেটা ওই অটোগ্রাফ ক্রেতার পরিচয় জানে। ওর মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। কিশোরের সই জোগাড়ের জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন লোকটা? জালটাল করে কোন কিছুতে ব্যবহার করবে না তো?

ছেলেটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আনমনে এ সব কথা ভাবছিল কিশোর। মনে মনে বলল, ছেলেটা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে। তবু টমকে ওর বাসায় পাঠাব সত্যতা যাচাই করতে।

যে লোকটা কিশোরের অটোগ্রাফ কিনে নিয়েছে সে মাঝারি উচ্চতার, রোগা, কালো চুল, লালচে গাল। কিশোরের সন্দেহ হলো ওই লোকটাই তার বাসায় বোমা রেখে গিয়েছিল কিনা। হয়তো ও-ই ওদের গাড়িটা নষ্ট করার জন্যে দায়ী। কিশোর ঠিক করল লোকটাকে খুঁজে বের করবে।

কিন্তু বৃথা খোঁজাখুঁজি চলল। ক্লান্ত হয়ে শেষে ওর চেনা এক ড্রাগ স্টোরে ঢুকল কিশোর। ওষুধের দোকানটার মালিক মিস্টার টনি। এখান থেকে বেশির ভাগ ওষুধপত্র কেনে কিশোর।

কিশোরকে দেখে হাসলেন আমুদে স্বভাবের মিস্টার টনি। 'কি ব্যাপার, কিশোর? কোন রহস্যের বেড়াজালে হাবুডুবু খেতে গিয়ে মাথা ধরেছে? অ্যাসপিরিন দেব?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'নতুন একটা রহস্যের বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছি ঠিকই, তবে অ্যাসপিরিনের দরকার নেই। আপনার কাছে এসেছি কিছু তথ্য পাবার আশায়।'

'তুমি যেহেতু আমার অনেক দিনের খদ্দের কাজেই তোমাকে ফ্রী তথ্য দিতে আপত্তি নেই আমার,' হাসিটা মুখে ধরে রেখেছেন মিস্টার টনি।

ওর অটোগ্রাফ কিনে নিয়েছে যে লোকটা তার বর্ণনা দিল কিশোর। জানাল লোকটাকে খুঁজছে সে।

মিস্টার টনি বললেন, 'মনে হয় কিছু সাহায্য করতে পারব তোমাকে। মাঝে মাঝে ফোন করতে আসে আমার দোকানে। লোকটার ডাক নাম সম্ভবত কিম। পুরো নাম জানি না। আজও লোকটা ফোন করতে এসেছিল। তাড়াহুড়োর চোটে বুদের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। বলতে শুনলাম সব ঠিকঠাকমত চলছে। ছেলেটার অটোগ্রাফ জোগাড় করে ফেলেছি আমি।'

তথ্য পেয়ে খুশি হলো কিশোর। তবে চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। মিস্টার টনিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ড্রাগ স্টোর থেকে।

সোজা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল কিশোর। ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে খুলে বলল একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। মনোযোগ দিয়ে কিশোরের কথা শুনলেন পুলিশ চীফ। 'তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে, কিশোর। আমি এখুনি লোক লাগিয়ে দিচ্ছি ওই কিম ব্যাটাকে খুঁজে বের করার জন্যে। তবে তুমি স্কটল্যান্ড যাবার আগে ওকে ধরতে পারব কিনা কথা দিতে পারছি না।

হাসল কিশোর। 'লোকটাকে ধরতে পারলেই হলো, যখনই হোক। আমার ধারণা এ সব রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত। ওকে ধরতে পারলে বা কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন।'

গ্লাসগো আর এডিনবার্গের কোন্ হোটেলে ওরা উঠবে সেগুলোর নাম ঠিকানা লিখে দিল কিশোর চীফকে। লেডি ওয়াগনারের ঠিকানা লিখতেও ভুলল না।

বাড়ি ফিরে এল কিশোর। মেরিচাচী জানাল ফোন করেছিল টম। বিদায় জানাতে আসবে কিশোরকে। তাকে ডিনারে আসতে বলে দিয়েছেন তিনি।

'ভাল করেছ,' বলে নিজের ঘরে ঢুকল কিশোর। মালপত্র এখনও সব গোছগাছ শেষ হয়নি।

টম এল ছ'টার দিকে। বলল, 'তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম না তো? তোমাকে একটা জিনিস দেখানোর জন্যে তর সইছিল না। এই দেখো।'

একটা দৈনিক কপি দিল সে কিশোরকে। পত্রিকার প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে চমকে উঠল কিশোর। ওতে বড় বড় অক্ষরে লেখা : অটোগ্রাফ শিকারীদের কবলে

পড়ে নাস্তানাবুদ দুর্ধর্ষ কিশোর গোয়েন্দা।

হেডিং-এর নিচে কিশোরের ছবি। সেই রহস্যময় লোকটাকে ধাওয়া করার সময় তোলা হয়েছে।

চার

কিশোর অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে খবরের কাগজের দিকে। টম বলল, 'তোমার স্কটল্যান্ড যাত্রার কথা আর তাহলে গোপন রাখতে পারলে না। পত্রিকায় জানিয়ে দিয়েছে তুমি আর তোমার চাচা স্কটল্যান্ড যাচ্ছ, তোমাদের আত্মীয়া লেডি ওয়াগনারের মূল্যবান জিনিস হারানোর রহস্য ভেদ করতে।'

'কিন্তু পত্রিকাওলারা এ খবর জানল কি করে?' কিশোর অবাক।

'মুসা আর রবিন বলে দেয়নি তো?' সন্দেহ প্রকাশ করল টম।

কিশোর নিশ্চিত ওরা দু'জন এ কাজ জীবনেও করবে না। তবু মনের খচখচানি দূর করতে দুই বন্ধুকে ফোন করল ও। দু'জনেই জোর দিয়ে বলল যার যার বাবা-মা ছাড়া আর কাউকে তারা স্কটল্যান্ড যাত্রার কথা বলেনি। মুসার বাবা-মা, রবিনের বাবা-মা সবাই জানালেন ওদের আসন্ন সফরের কথা বাইরের কারও কাছে ফাঁস করেননি তাঁরা।

আরও চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। কাগজের লেখাটা পড়ে ফেলল। 'দেখো দেখো, কাণ্ড! লিখেছে লেডি ওয়াগনার নাকি নিজেই স্বীকার করেছেন জিনিসটা হারিয়ে গেছে। হারানো শব্দটার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।'

টম কয়েক সেকেন্ড গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিশোরের দিকে। বলল, 'কিশোর, স্কটল্যান্ড যাওয়াটা কি খুব জরুরী?'

'অবশ্যই জরুরী। কেন?'

'তোমাদের বাড়িতে আসার আগে একটা বেনামী ফোন পেয়েছি। একটা অপরিচিত কণ্ঠ বলেছে তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাইলে ওকে স্কটল্যান্ড যেতে দিয়ো না।'

টমের কথা শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কিশোরের। তারমানে অদৃশ্য শত্রু ভালভাবেই লেগেছে ওর পেছনে। 'আমি এক্ষুণি পত্রিকা অফিসে ফোন করছি,' কিশোর বলল। 'আরটিকলটা কে লিখেছে, কোত্থেকে সূত্র পেয়েছে জানা দরকার।'

কিন্তু পত্রিকা অফিসে ফোন করেও লাভ হলো না কোন। এক তরুণী জানাল অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি চলে গেছে। আর তরুণী এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে অপারগ। একঘেয়ে কণ্ঠে 'কাল সকালে ফোন করবেন' বলে লাইন কেটে দিল সে।

ডিনার খেতে খেতে খবরের কাগজের লেখাটা নিয়ে আলোচনা হলো। রাশেদ পাশাও আছেন।

'টম, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? আরটিকলের কোথাও কিন্তু লেখা নেই মূল্যবান জিনিসটা চুরি হয়েছে,' কিশোর বলল। 'সন্দেহও প্রকাশ করা হয়নি। অথচ হারিয়েছে যখন, চুরিও তো যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস,' রাশেদ পাশা বললেন। 'চুরির সম্ভাবনার কথা লিখল না কেন ভেবে খটকা লাগছে।'

কিশোর বলল, 'হয়তো যে লোক ওই গল্পের তথ্য যুগিয়েছে সে জানত মূল্যবান জিনিসটা চুরিই হয়েছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে বললে, চুরির কথা না তুললে পুলিশ বা অন্য কেউ আর চোরের খোঁজ করবে না। এ কারণেই চুরির শব্দটা সযত্নে এড়িয়ে গেছে।'

'তোর কথায় অবশ্য যুক্তি আছে,' প্রশংসা করলেন রাশেদ পাশা।

টমের দিকে তাকাল কিশোর। 'কাল সকালেই তো আমরা চলে যাচ্ছি। পত্রিকার ব্যাপারটার কি হবে? তুমি খোঁজ নেবে?'

হাসল টম। 'খোঁজ নিতে গিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলি যদি?'

হাসল কিশোরও। 'তাহলে বেশ হয়। তুমিও গোয়েন্দা বলে পরিচিত হয়ে উঠবে। অবশ্য ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের অনেক কাজে আসতে পারো।'

'আমার ওপর ভরসা করার জন্যে ধন্যবাদ, ডিটেকটিভ কিশোর পাশা,' বলল টম। 'আর কোন কাজ?'

'একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলা হয়নি,' কিশোর বলল। ডাকবাক্সে বোমা রাখার ঘটনাটা জানাল টমকে সে। শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল টমের।

কিশোর বলল, 'আমি চিঠিটার একটা ট্রেসিং করেছি। যাবার আগে তোমাকে দিয়ে দেব। চিঠিটা কে লিখেছে খুঁজে বের করতে পারো কিনা দেখো।'

কিটি রোভারের কথাও কিশোর বলল। 'সময় পেলে ছেলেটার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এসো।'

'যাব,' বলল টম।

বিদায় নেয়ার সময় টম বলল, 'আজ রাতে বাসায় ফিরছি না আমি। এক খালার বাসায় যাব। রেডি হয়ে থেকো। খালার বাসা থেকে এসে তোমাদের আমি এয়ারপোর্টে এগিয়ে দিয়ে আসব।'

'বেশ, তুমি সাতটার মধ্যে চলে এসো। আমরা রেডি হয়ে থাকব,' জানাল কিশোর।

পরদিন সকালে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় কিশোরের বাড়ি চলে এল টম। কিশোরদের মালপত্র গাড়ির পেছনের বনেটে তুলে দিল। মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল কিশোর বিদায় মুহূর্তে, তারপর চড়ে বসল গাড়িতে।

মুসা আর রবিন রেডি হয়েই ছিল। ওরা পেছনের সীটে কিশোরের সঙ্গে বসল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা। হাসার কারণটা হলো, পরামর্শ করেই তিনজনে এক রকম কাপড় পরে এসেছে। নেভী ব্লু কোট আর সাদা প্যান্ট। সুর করে মুসা বলল, 'আমরা তিনজন নীল পাখি।'

এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। বিদায় মুহূর্তে সবার সঙ্গে হাত মেলাল টম, বলল, 'জন্মদিনের কথাটা ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'ভুলব না।'

খানিক পরে বিমান উড়াল দিল আকাশে। গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। রাশেদ পাশার কিছু জরুরী কাজ আছে। সেজন্যেই সরাসরি স্কটল্যান্ডের দিকে না গিয়ে ওখানে যাওয়া। প্লেনে বসে খুনসুটি আর গল্প করে কেটে গেল সময়। নিউ ইয়র্ক পৌঁছে তিন গোয়েন্দাকে কিশোরের 'রীনা আন্টির' বাড়ি চলে যেতে বললেন রাশেদ পাশা। তিনি কাজ সেরে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। ছেলেরা যেন রেডি হয়ে থাকে। কারণ সন্ধ্যার পর পরই প্লেন ছাড়বে স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে।

মিস রীনা বার্টসন স্কুলের টীচার, মেরিচাচীর কাজিন। সেই সম্পর্কে রাশেদ পাশার শালী। কিশোরকে খুব ভালবাসেন। মুসা আর রবিনকেও পছন্দ করেন। আগেও এখানে বেড়াতে এসেছে ওরা।

শহরের উপকণ্ঠে সুসজ্জিত একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন রীনা আন্টি। কিশোরদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

'তোমাদের দেখে কি যে ভাল লাগছে আমার,' আন্টি বললেন। 'থাকবে তো ক'দিন?'

হাসল কিশোর। 'ক'দিন কি বলছেন? বড় জোর এক ঘণ্টা। সন্ধ্যায় প্লেন। আন্টি, থাকতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু আমাদের অনেক তাড়া।'

অল্প কথায় রীনা আন্টিকে সব খুলে বলল কিশোর।

শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, 'স্কটল্যান্ডে গিয়ে কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে তোমরা। কোন ঝামেলায় জড়াবে না।'

বাধ্য ছেলের মত মাথা দোলাল কিশোর। সেটা 'হ্যাঁ' না 'না' বোঝা গেল না।

'দাঁড়াও, স্কটল্যান্ডেই যখন যাচ্ছ, ওখানকার একটা বিশেষ জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

রীনা আন্টি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলেন লম্বা, সরু, আবলুস কাঠের একটা জিনিস। 'এটা এক ধরনের বাঁশি। ব্যাগপাইপ নামে যে স্কটিশ বাঁশিগুলো আছে, সেটা থেকে খুলে নেয়া। ক'দিন আগে এক বাঁশিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি।'

'বাজিয়ে শোনান না,' অনুরোধ করল মুসা।

হাসলেন রীনা আন্টি। বাঁশিটা ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। চমৎকার একটা সুর তুললেন বাঁশিতে।

'এটা স্কটস হোয়া হেই গানের সুর,' জানালেন তিনি।

'দারুণ তো!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কিশোর। 'আন্টি, আপনি এত ভাল বাঁশি বাজাতে পারেন জানতাম না। আচ্ছা স্কটস, হোয়া হেই কথার মানে কি?'

জবাবে কৌতুক ঝিলিক দিল রীনা আন্টির চোখে। তিনি স্কটিশ উচ্চারণে স্কটল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের গানের দুটো চরণ গেয়ে শোনালেন:

'স্কটস, ওয়া হেই উই ওয়ালেস ব্লেড,
স্কটস, ওয়াম ব্রুস হ্যাজ আফেন লেড।'

রীনা আন্টি জানালেন গানের কথা আর সুর তৈরি করেছিলেন স্কটিশ কবি রবার্ট বার্নস, ১৩১৪ সালে ব্যাটল অভ ব্যানকবার্নের যুদ্ধের চিত্রটা গানে-কবিতায়

স্মরণীয় করে রাখার জন্যে।

'প্রচুর রক্ত ঝরেছিল সেই যুদ্ধে,' আফসোস করে বললেন রীনা আন্টি। 'এই স্কটিশ কথাগুলোর মানে হলো: "স্কটস, ওয়ালেসদের সঙ্গে যুদ্ধে যাদের প্রচুর রক্ত ঝরেছে; স্কটস, ব্রুস যুদ্ধে যাদের প্রচুর নেতৃত্ব দিয়েছে।"'

'দিন তো দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আমি বাজাতে পারি নাকি।'

'পারবে। সহজ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি নোট বা সুরগুলো কি কি আর কোথায় আঙুল রেখে বাজাতে হবে।'

রীন্টা আন্টির কথামত কিশোর ঠিকঠাক জায়গায় আঙুল রাখার পরে তিনি বললেন, 'এবার বাঁশিতে ফুঁ দাও। সেই সাথে আঙুল তুলতে আর নামাতে হবে। ওটাই আসল। যতক্ষণ না ঠিকমত পারবে, সুর উঠবে না।'

প্রথম প্রথম বাঁশিটা ঠিকমত ধরতেই পারল না কিশোর, ফুঁ দেয়ার কায়দাটাও ঠিক হলো না। রীনা আন্টি বার বার দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কায়দাটা বাজানোর কৌশল শিখে ফেলল কিশোর। সুরও তুলতে পারল ঠিকমত। তবে রীনা আন্টির মত অত দ্রুত পারল না। এর জন্যে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। বাজাবে নাকি, মুসা আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল সে। সজোরে মাথা নাড়ল দু'জনেই।

'আমার অত বাদক হবার খায়েশ নেই,' সাফ মানা করে দিল মুসা।

স্কটিস হোয়া হেই গানের সুরও তুলে ফেলল কিশোর দেখতে দেখতে।

'বাহ্, দারুণ!' তারিফ করল রবিন। 'কল্পনাই করিনি এত দ্রুত শিখে ফেলবে তুমি।'

কিশোর নিজেও খুশি তার সাফল্যে।

'আবার বাজাব?' মুচকি হেসে বলল ও। সুরটা আবার তুলল বাঁশিতে। বার বার তুলতে লাগল।

রীনা আন্টি হাসিমুখে বললেন, 'সময় কাটানোর জন্যে বাঁশি বাজানোর মত মজা হয় না। স্কটল্যান্ড গেলে আরও গান শিখতে পারবে।'

'গান শেখার সময় পাবে কিনা কিশোর, যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বলল রবিন। 'জোড়া রহস্য ভেদ করতেই ওর সময় কেটে যাবে।'

'রহস্য ভেদ করতে গিয়ে মারা পড়ো না, এটাই হলো আমার কথা,' আবার সাবধান করলেন রীনা আন্টি।

বেরোনোর সময় হলো। আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমান বন্দরে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

রাশেদ পাশা অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্যে। সবাই মিলে চড়ে বসল প্লেনে। বিলাসবহুল প্লেন, আরামদায়ক আসন। ডিনার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল তিন বন্ধু। সকাল ছ'টা নাগাদ স্কটল্যান্ড পৌঁছুবে প্লেন। আমেরিকান সময় তখন রাত একটা।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পরে মুসা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারল না কোথায় আছে সে। রবিন তাকে উঠে পড়তে বললেও জেদ ধরে রইল আরও ঘুমাবে। কিন্তু কফি আর স্যান্ডউইচের মন মাতানো গন্ধে ঘুমের রেশ পুরোপুরি কেটে গেল

তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। ওর হুমহাম করে খাওয়ার দৃশ্য দেখে হাসল কিশোর আর রবিন।

তার দিকে দু'জনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল মুসা। 'এত সুন্দর দুনিয়ায় জন্মে যদি খাবারই না খেলাম, জন্মানোটাই বৃথা!'

ওর এই দার্শনিক উক্তির জবাবে ব্যঙ্গ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রবিন, এমন সময় প্লেনটা ভয়ানক ঝাঁকি খেতে শুরু করল। চমকে গেল যাত্রীরা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ। বিপদ না তো!

পাঁচ

প্লেনটা বার বার ঝাঁকি খেয়েই চলেছে। ভয়ে বাকরুদ্ধ মুসা, চোখ বুজে আছে। কিশোর আর রবিন শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রেখেছে যে যার সীট।

ঝাঁকির চোটে কাপ আর ডিশগুলো যেন ডানা মেলে উড়ছে। ছিটকে যাচ্ছে চার দিকে, খাবার-দাবার ছিটকে এসে লাগছে যাত্রীদের নাকে-মুখে-গায়ে। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল ঝাঁকুনি।

ক্যাপ্টেন এসে ক্ষমা চাইলেন সবার কাছে। 'সরি! আমাদের অটোমেটিক পাইলটে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তবে ঘাবড়াবেন না। আর কোন সমস্যা হবে না। আমরা ম্যানুয়াল কন্ট্রোলে এখন প্লেন চালাচ্ছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিন বন্ধু। কিছুক্ষণ পরে ওদের বিমান চক্কর খেতে লাগল প্রেস্টউইক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে ঘিরে।

'স্কটল্যান্ডে এসে পড়েছি,' উল্লসিত কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরি শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের।'

ভ্রুকুটি করল মুসা। 'তোমার মাথায় তো গোয়েন্দাগিরির চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ঢোকে না। কেন, আমরা ওসব ভুলে গিয়ে এত সুন্দর দেশটাতে শুধু ঘুরে বেড়াতে পারি না?'

হাসতে হাসতে টার্মিনালে ঢুকল ওরা। মালপত্র নেবে। ওখানে ওদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা হলো। টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন রাশেদ পাশা। ড্রাইভারের বয়স চল্লিশের কোঠায়। মাথায় কুচকুচে কালো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। নিজের নাম জানাল রজার ম্যাকলিন। ড্রাইভারকে গ্লাসগো যেতে বলে রাশেদ পাশা সদলবলে চড়ে বসলেন ট্যাক্সিতে।

তিন বন্ধু যথারীতি পেছনের সীটে বসেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার রসিক মানুষ। মজার মজার কথা বলছে। তার স্কটিশ উচ্চারণ আর মজার মজার গল্প শুনে ওরা প্রচুর হাসাহাসি করল। রাস্তার পাশের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে চলেছে রজার ম্যাকলিন। দেখতে দেখতে গ্লাসগো শহরের উপকণ্ঠে চলে এল ওরা। এদিকে শত শত সীগালের ভিড় দেখে কিশোর আর তার বন্ধুরা রীতিমত মুগ্ধ ট্যাক্সি ড্রাইভার জানাল এই সীগালরা সমুদ্রগামী জাহাজের পেছনে মাইলের প-

মাইল পথ পাড়ি দেয় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের আশায়। বেশ কিছু পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়ি দেখেও মজা পেল ওরা। প্রতিটা বাড়িতে অনেকগুলো করে মাটির চিমনি। একটা বাড়িতে গুনে দেখল ন'টা চিমনি।

'এত চিমনি কি কাজে লাগে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'এ সব বাড়ির সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম নেই,' জবাব দিল রজার ম্যাকলিন। 'তাই প্রতিটা ঘরে একটা করে ফায়ারপ্লেস আছে। আর ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে চিমনি তো থাকবেই।'

'আমেরিকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোতে ওসবের বালাই নেই,' বলল কিশোর। 'সেখানে সেন্টার হল দিয়ে তাকালে বাড়ির পেছনের বাগান পর্যন্ত দেখা যায়।'

মুচকি হাসল ট্যাক্সি ড্রাইভার। 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ওপেন ক্লোজ আর ক্লোজড ক্লোজ-এর কথা শোনোনি?'

সবাই একযোগে ডানে আর বামে মাথা নাড়ল। শোনেনি। রজার ম্যাকলিন বলল, 'আমাদের ঘর বাড়িগুলো, আমেরিকান ভাষায় তোমরা যেগুলোকে বলো অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, সে-সব বাড়ির একটা সাধারণ প্রবেশ পথ থাকে। ওটাকে বলে ক্লোজ। যদি প্রবেশ পথে দরজা থাকে তাহলে ওটার নাম হবে ক্লোডজ ক্লোজ আর দরজা না থাকলে ওপেন ক্লোজ।'

ড্রাইভারের কথা শুনে হাসল কিশোর। 'আপনাদের দেশের অনেক কিছুই শেখার বাকি রয়ে গেছে। না বুঝে আমরা হয়তো ভুল করে বসব, লোকে তখন ভুল বুঝবে আমাদের।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ওরকম একটু আধটু ভুল করলে কিছু আসে যায় না,' ওদেরকে আশ্বস্ত করল রজার ম্যাকলিন।

রেল স্টেশনের পাশে আকর্ষণীয় একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে কিশোররা তিনজনে ঢুকল লবিতে, রাশেদ পাশা রিজার্ভেশনে গেলেন ওদের আগমনী সংবাদ দিতে। দশ মিনিট পার হয়ে যাবার পরেও চাচা ফিরছেন না দেখে উদ্বেগ বোধ করল কিশোর। নিজেই পা বাড়াল রিজার্ভেশনের দিকে। অবাক হয়ে দেখল রাশেদ পাশা ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে তর্ক করছেন। শুনল চাচা, বলছেন, 'আমি তো আপনাকে ফোন করেছি।'

শেষে 'কি আর করা' ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক, দুটো চাবি ধরিয়ে দিল রাশেদ পাশা'র হাতে, ডাকল একজন পোর্টারকে। লিফটে ওঠার আগে রাশেদ পাশা কিশোরদের জানালেন রিজার্ভেশন বইতে তাঁর নামের ভুল বানান লেখার কারণে ক্লার্কের সঙ্গে তর্ক হয়েছে। পাশার বদলে সে লিখেছে পেইশা।

রাশেদ পাশা'র রুম থেকে অল্প দূরে কিশোরদের ঘর। ওদেরকে বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে নে। আমি যাই। বাথরুম দরকার।' চলে গেলেন তিনি নিজের ঘরে।

ওদের ঘর দেখে খুব খুশি কিশোর, রবিন এবং মুসা। বেশ বড় রুম, সাজানো গোছানো, অ্যাটাচড বাথ। মুসা ঘোষণা করল জীবনেও নাকি এত বড় টার্কিশ তোয়ালে দেখেনি। 'কমপক্ষে সাত ফুট হবে তোয়ালেগুলো,' বলল সে।

আলমারির টপ ড্রয়ার খুলল কিশোর। জামা কাপড় রাখবে। ড্রয়ারের ভেতরে একটা কাগজ। কাগজটাতে ওর চোখ আটকে গেল।

'রবিন! মুসা!' উত্তেজিত গলায় ডাকল কিশোর। 'এদিকে এসো। একটা রহস্যময় জিনিস দেখে যাও।'

দৌড়ে এল ওরা কিশোরের কাছে। কাগজটাতে অদ্ভুত লেখা দেখে ওরাও হতভম্ব।

'এ লেখার মানে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। জোরে জোরে পড়ে শোনাল, 'র‍্যাটহ্যাড ডিগ গ্লাস স্ল্যাট লঙ মল বীন বল গান অ্যাইল।'

'ড্রইংগুলোও কি অদ্ভুত দেখো,' মুসা বলল।

কাগজের উপরে বাম কোনায় একটা ব্যাগপাইপের ছবি। তার উল্টোদিকে একটা দোলনার মত কিছু, দেখতে নৌকার মত। আর নিচে বাঁ দিকের ছবিটা দেখে মনে হয় একটা আধুনিক দালানের খণ্ডাংশ।

হাসল মুসা। 'এর মধ্যে রহস্যের কিছু তো দেখছি না। হবে হয়তো কোনও বাচ্চা ছেলের কাজ। হিজিবিজি যা খুশি এঁকেছে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'যে বাচ্চাটা ছবি এঁকেছে সে-ই হয়তো এই অর্থহীন কথাগুলো লিখেছে।'

ওদের সঙ্গে একমত হতে পারল না কিশোর। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পেল টেলিফোন বেজে ওঠায়। রাশেদ পাশা ফোন করেছেন ভেবে রিসিভার তুলল কিশোর। ওর চাচা নন, ফোন করেছে ডেস্ক ক্লার্ক। উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ।

'মিস্টার পাশা বলছেন?'

'আমি কিশোর পাশা।'

'ও, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, কিশোর,' বলল সে। 'তোমাদের নামে ভুল রুম বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি এখুনি একজন পোর্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি মালপত্রগুলো নিয়ে আসার জন্যে। ও তোমাদেরকে নতুন রুমে নিয়ে যাবে।।'

বন্ধুদেরকে খবরটা দিল কিশোর। মুসা বলল, 'ভাগ্যিস, সুটকেস খুলিনি। তবে এমন অভিজাত হোটেলে এ ধরনের ভুল মেনে নেয়া যায় না।'

কিশোর অদ্ভুত লেখাটার ওপর মনোযোগ দিল। ওর স্মরণশক্তি সাংঘাতিক প্রখর। লেখা এবং ছবিগুলো মনে গেঁথে নিল। আর কোনদিন ভুলবে না। আলমারি বন্ধ করতে করতে কিশোর বলল, 'যে লোক এ ঘরে আসছে এখন, এই লেখার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'লেখাটা আসলে একটা কোড, এই তো বলতে চাইছ তুমি?' রবিনের প্রশ্ন।

'হতে পারে,' জবাব দিল কিশোর।

ইতিমধ্যে পোর্টার চলে এল মালামাল নেয়ার জন্যে। ওরা নতুন রুম পেল হলঘরেই, রাশেদ পাশার রুমের বিপরীতে। রুমে ঢুকে কিশোর বলল, 'চাচাকে জানানো দরকার আমরা ঘর বদল করেছি,' পোর্টারের দিকে ফিরল সে। 'আমরা যে রুমটা ছেড়ে দিলাম ওটা মিস্টার পেইশার ঘর ছিল, তাই না?'

'জ্বী, মাস্টার। উনি ওটার রিজার্ভেশন নিয়েছেন। আপনারা ওঁর রুম দখল

করেছেন শুনে ভীষণ রেগে গেছেন।'

হাসল মুসা। 'লোকটা ভেবেছে তার ঘরটা নোংরা করে দেব আমরা।'

ওসব ভেবে ওই লোক বিরক্তি হয়নি, কিশোর নিশ্চিত। তার মনের ভেতর খচখচ করছে অদ্ভুত লেখাটা নিয়ে। কাগজটা কিশোররা দেখে ফেলতে পারে ভেবেই কি মিস্টার পেইশা রেগে গেছে? হয়তো লেখাটায় তার জন্যে কোন গোপন মেসেজ ছিল। চাচার সাথে লাঞ্চের টেবিলে বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর।

'তা হওয়া বিচিত্র নয়,' সায় দিলেন রাশেদ পাশা। 'তবে বৈধ কাজেও অনেক সময় কোড ব্যবহার করা হয়। কাজেই ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে না দেখলেও চলে।'

চাচার সঙ্গে একমত হতে পারল না কিশোর। 'আমাদের ডাকবাক্সে যে চিঠিটা পেয়েছিলাম ওতে লেখা ছিল "পেইশা তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে"। যে লোক আমাদের সাবধান করে দিতে চেয়েছিল সে হয়তো পাশা, আর পেইশা নামের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছে। তোমাদের কি ধারণা?'

'কিন্তু পাশাই বা বোমা মারতে যাবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমার ধারণা, পেইশার কথাই বলেছে লোকটা। হোটেলের এই পেইশাই সেই পেইশা নয়তো?'

মুসা ঝুঁকে এল কিশোরের দিকে। 'আমাদের পাশের টেবিলের লোকটাকে লক্ষ করো। ব্যাটা আমাদের সমস্ত কথা গিলছে।'

কিশোর তাকাল পাশের টেবিলে। বছর চল্লিশ হবে লোকটার বয়স, পেশীবহুল শরীর, বসে আছে একা। গায়ের রঙ লালচে। তাকিয়ে ছিল কিশোরের দিকে। কিশোর তার দিকে ফেরা মাত্র মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে, ঝটপট বিলে সই করে চলে গেল টেবিল ছেড়ে।

কিশোররা ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করল। তারপর উঠে দাঁড়াল। এক ওয়েট্রেস গেছে আগন্তুকের টেবিলের বিল নিতে। ওদিকে এগিয়ে গেল কিশোর, নার্সকে পাশ কাটানোর সময় এক ঝলক চোখ বোলাল বিলের ওপর। যে রুমটা কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে এসেছে কিশোররা বিলের গায়ে ওটার নম্বর লেখা।

এ লোক মিস্টার পেইশা না হয়ে যায় না, ভাবল কিশোর। লবিতে চলে এল ও। পেছন পেছন ওর দুই সহকারী। বিলের কথা ওদেরকে বলল কিশোর। চারপাশে কোন দিকে তাকিয়ে আগন্তুককে দেখতে পেল না।

'তোর ভুলও হতে পারে, কিশোর,' বললেন রাশেদ পাশা। 'কাজেই ওই লোক সম্পর্কে ফট করে কোন উপসংহারে চলে আসা ঠিক না। বিকেলে আমার বিজনেস কনফারেন্স। তোরা ঘরে বসে কি করবি? তারচেয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে কোনখান থেকে ঘুরে আয় না।'

'তা মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কোথায় যাব? এ শহরের কিছুই চিনি না।'

'হেড পোর্টারকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। আকর্ষণীয় জায়গাগুলো চিনিয়ে দেবে। কোত্থেকে গাড়ি ভাড়া করলে সুবিধে হবে তাও বলতে পারবে। বললে গাড়িও ভাড়া করে দিতে পারে।'

রাশেদ পাশা চলে গেলেন। কিশোর হেড পোর্টারের কাছে গেল। বলল শহরের আকর্ষণীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে চায় ওরা। গাড়ি ভাড়া করবে। পোর্টার কি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে? পোর্টার রাজি হয়ে গেল সানন্দে। বলল গাড়ি ভাড়া করতে কোন সমস্যা নেই।

'তোমার ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?' জানতে চাইল সে।

'আছে।'

একটা এজেন্সিকে ফোন করল পোর্টার। তারা জানাল আধঘণ্টার মধ্যে হোটেলে একটা ছোট গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

'লক লোমোন্ডে গেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল পোর্টার। যায়নি শুনে ওখানে যাবার পরামর্শ দিল সে।

'খুব সুন্দর জায়গা,' বলল পোর্টার। 'যাবার পথে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে থামতে পারো। প্রাচীন এবং বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়। রেইনকোট নিতে ভুলো না যেন। স্কটল্যান্ডের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। এই রোদ এই বৃষ্টি।'

পোর্টার একটা ম্যাপ বের করে দেখাল কিশোরদেরকে। কয়েক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিল। এ সব জায়গায় ওদেরকে ঘুরতে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

'আশা করি সময়টা ভাল কাটবে তোমাদের,' ম্যাপটা কিশোরের হাতে দিল পোর্টার। 'গাড়ি চালানোর সময় মনে রেখো, এ দেশে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি চালানোর নিয়ম।'

কিশোর বলল এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আধঘণ্টা পরে ভাড়া করা গাড়িতে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঠিক করল, প্রথমে ইউনিভার্সিটি দেখতে যাবে।

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি দেখে মুগ্ধ হলো ওরা। বিশাল এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। ধূসর রঙের পাথুরে বিল্ডিংগুলো দেখার মত। একসারিতে দাঁড়ানো।

গাড়ি চালিয়ে শহর ছেড়ে চলে এল কিশোর, ছুটল লক লোমোন্ডের রাস্তা ধরে। গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ল ওরা। অপূর্ব নিসর্গ দেখে শিস দিল মুসা, 'আহ, প্রকৃতি কত সুন্দর। পাতাবাহারের ঝোপগুলো দেখছ? অপূর্ব! কিশোর, গাড়ি থামাও। আমি কাছ থেকে দেখব।'

রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। শুধু পাতাবাহার নয়, ফণিমনসা, বৈঁচিরও ঝোপ রয়েছে প্রচুর। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

আবার গাড়ি চালাল কিশোর। রবিন ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করল কতগুলো মাঙ্কি পাজল গাছের দিকে। গাছগুলোর ডালপালাগুলো মোচড়ানো, একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে। 'ওক আর এলমের তুলনায় এই অদ্ভুত নামের বানুরে-গাছগুলো অনেক ছাড়া ছাড়া ভাবে বেড়ে উঠেছে লক্ষ করেছ?'

কিন্তু কেউ মুসার কথার জবাব দেয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সাবধান, কিশোর! গাড়ি আসছে রং সাইড দিয়ে!'

বার বার হর্ন টিপতে লাগল কিশোর। কিন্তু ড্রাইভার পাত্তা দিল না। কি করবে বুঝতে পারছে না। কিশোর যে পাশে আছে সেদিকে থাকলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য। কিন্তু রাস্তার বিপরীত দিকে যাবার চেষ্টা করলে উল্টো দিক থেকে আসা

গাড়ির ড্রাইভারও একই কাজ করে বসতে পারে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে মুসার। আর্তনাদ করে উঠল, 'খাইছে! গুঁতো মারতে আসছে তো!'

ছয়

তীরবেগে ছুটে আসছে গাড়িটা। রাস্তার অন্য পাশে সরার কোন ইচ্ছেই তার আছে বলে মনে হলো না।

গাড়ি না থামিয়ে উপায় নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। মুহূর্তে রাস্তার পাশে নেমে পড়ল ও। গাড়ি ঢুকে গেল একটা বেড়ার মধ্যে। ব্রেক কষল। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর গাড়ির ড্রাইভার ঝুঁকে পড়ল তার স্টিয়ারিং হুইলের ওপর, সাঁৎ করে গাড়ি নিয়ে এল তার বাঁ দিকের রাস্তায়।

বিদ্যুৎ গতিতে কিশোরদের পাশ কাটাল ড্রাইভার, ডান হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছে মুখ।

'লোকটা উন্মাদ!' রেগে গেছে মুসা।

'সেয়ানা পাগল বলো। দেখলে না হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে রেখেছিল যাতে তাকে আমরা চিনতে না পারি,' বলল রবিন।

কিশোর কোন মন্তব্য করল না। চুপচাপ বসে আছে ড্রাইভিং সীটে। গা কাঁপছে এখনও। একটুর জন্যে ভয়াবহ একটা অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বেড়াটা ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এজন্যে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ভাবল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বেড়ায় ঘের বাড়িটা একতলা। পাথরে তৈরি। প্রবেশ পথটা ধনুকাকৃতির।

মুসা আর রবিন উত্তেজিত হয়ে দুর্ঘটনার আলোচনা করছে। রবিন গাড়িটার লাইসেন্স নাম্বার টোকার চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি। শুধু আংশিক নম্বর টুকেছে: জিবি-২।

মুসা বলল, 'কিশোর। স্কটিশ পশমী কাপড়ে মোড়া সেই হুমকিপত্রের কথা মনে আছে? সেই একই লোকের হামলা নয়তো এটা?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'লোকটা ভুল করে রং সাইডে গেলেও আমার হর্ন শুনে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

বিল্ডিং-এর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বছর পঞ্চাশ বয়েসের এক মোটাসোটা মহিলা। এগোলেন কিশোরদের দিকে। তাঁকে দেখে গাড়ি থেকে নামল কিশোর। মুসা আর রবিনও নামল।

'ঘটনাটার জন্যে আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল কিশোর: 'আসলে দোষটা আমার ছিল না। আমি অ্যাক্সিডেন্ট এড়াতে গিয়ে···,' মহিলাকে সব খুলে বলল সে। রাস্তায় পলাতক ড্রাইভারের গাড়ির টায়ারের চিহ্ন ফুটে আছে। দেখতে পেলেন মহিলা।

'আপনার ভাঙা বেড়ার জন্যে যা ক্ষতিপূরণ লাগে দিতে রাজি আছি আমি,' শেষে কিশোর বলল।

কড়া স্কটিশ উচ্চারণে মহিলা বললেন, 'না। না। তার দরকার হবে না। তোমাদের যে কোন ক্ষতি হয়নি তাতেই আমি খুশি।'

রাস্তার বেসামাল ড্রাইভারদের কাণ্ডজ্ঞানহীন গাড়ি চালানো নিয়ে কিছুক্ষণ বিষোদগার করলেন তিনি।

কিশোর বলল, 'গাড়িটাকে সরাচ্ছি। বেড়ার কতটা ক্ষতি হয়েছে বোঝা যাবে।'

দেখা গেল তেমন ক্ষতি হয়নি। কিশোর আবারও ক্ষতিপূরণ দিতে চাইল। মহিলাও নেবেন না। মাথা নেড়ে বলল, 'তোমরা ঠিকই আমাদের দেশের আইন মেনে চলেছ। কাজেই অন্যের দোষের জন্যে তোমাদেরকে দোষারোপ করতে পারি না।'

মিসেস ডর্নকে ধন্যবাদ দিল কিশোর। হাসিমুখে জানতে চাইল, 'বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি চালানোর নিয়ম কবে থেকে শুরু হয়েছে আপনাদের?'

মহিলা জানালেন, অনেক আগে স্কটল্যান্ডের রাস্তাঘাট ঘোড়সওয়ারদের জন্যে নিরাপদ ছিল না। প্রায়ই ডাকাতেরা হামলা চালাত। বিপরীত দিক থেকে আসা হামলাকারীকে রোখার জন্যে তাই তাদেরকে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে ঘোড়া চালাতে হতো। বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম থাকত। ডান হাতে সদা প্রস্তুত তরবারি।

মুসা বলল, 'ভাগ্যিস ওই বিপজ্জনক সময়ে আমার জন্ম হয়নি।'

মিসেস ডর্ন হাসলেন, 'আমার তো মনে হয় আগের চেয়ে এখন রাস্তাঘাটে চলা অনেক বেশি বিপজ্জনক। তোমাদের এই অ্যাক্সিডেন্টটাও তো তার প্রমাণ।'

মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক লোমোন্ডের দিকে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় খামার বাড়ি আর উঁচু উঁচু পাথরের দেয়াল দেখে বেশ মজা পেল তিন বন্ধু।

একটু পরে লক লোমোন্ড চোখে পড়ল ওদের। পাহাড় ঘেরা প্রকাণ্ড একটা লেক। স্ফটিক স্বচ্ছ জল। লেকের মাঝখানে ছোট ছোট অনেক দ্বীপ। দূর থেকে বিন্দুর মত লাগছে।

একটা খাঁড়ির পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। এক সারি হাউসবোটের দিকে চোখ আটকে গেল ওর। জানালাসহ প্রকাণ্ড চৌকোনা বাক্সের মত হাউসবোটগুলো। একেকটা একতলা সমান উঁচু, সাদা রং করা। প্রতিটা হাউসবোটের নিজস্ব ডক বা জাহাজঘাটা রয়েছে।

উত্তেজিত গলায় কিশোর বলল, 'দেখো, হাউসবোটগুলো। হোটেল রুমের সেই ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' সায় দিল রবিন। 'কিন্তু হাউসবোটের সঙ্গে আমাদের রহস্যের কি সম্পর্ক?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'সম্পর্ক থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। তবে জরুরী সূত্র হতে পারে এটা।'

মুসা এ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। খানিক আগেও আকাশ

ছিল ঝকঝকে, পরিষ্কার। এখন কালো কালো মেঘ ঢেকে ফেলছে সূর্য। বাতাসের বেগও বাড়ছে।

'খুব বেশি দূরে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের,' বলল সে। 'ঝড় আসতে পারে। হোটেলে তাড়াতাড়ি ফিরে যাই, কি বলো?'

কিশোর সায় দিল ওর কথায়। বলল আর সামান্য একটু এগিয়ে দেখেই ফিরে যাবে। পানির খুব কাছ দিয়ে গেছে রাস্তা। খানিকটা এগোনোর পরে তীরের কাছে পাথরের ছোট একটা বেদী চোখে পড়ল ওদের। বেদীর ওপরে একটা বাচ্চা ছেলের মূর্তি।

'মূর্তিটা এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমি গাইড বইতে মূর্তিটার কথা পড়েছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওই বাচ্চাটা এখানে ডুবে মারা যায়। তার বাবা-মা বাচ্চার স্মরণে মূর্তিটা বানান।'

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা!' বিড়বিড় করল মুসা।

লুস নামে ছোট একটা শহরে এসে ঢুকেছে ওরা। জোর গতিতে বইতে শুরু করল বাতাস। ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। তীব্র গতিতে বাতাস আছড়ে পড়ছে গাড়ির ওপর। ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। হুইলের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো কিশোরকে গাড়িটাকে উল্টে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে।

'জলদি চলো!' মিনতি করল মুসা। 'বাতাসের মতিগতি মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার।'

স্পীড বাড়াল কিশোর। সেই খাঁড়ির কাছে চলে এল যেখানে হাউসবোটগুলো বাঁধা। খাঁড়িতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভয়ানক দুলছে জলযানগুলো।

'এ রকম আবহাওয়ায় লক্ষ টাকা দিলেও আমি হাউসবোটে থাকতাম না,' ওদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রবিন।

হঠাৎ লেক থেকে ভীষণ বেগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে এল ঝোড়ো বাতাস, ভয়ানক শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল ওদের গাড়ির ওপর। বাতাসের ধাক্কায় রাস্তার অন্যপাশে ছিটকে চলে গেল গাড়ি। প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক কষল কিশোর। ডিগবাজি খেতে গিয়েও খেল না। স্থির হয়ে রইল যান্ত্রিক বাহন।

মুসা আর রবিন দুলতে থাকা হাউসবোটগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'একটা বোট উল্টে যাচ্ছে।'

চট করে ওদিকে তাকাল কিশোর। সারির তিন নম্বর হাউসবোটটা ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় দলছুট হয়ে ছিটকে গেছে, আছড়ে পড়েছে তীরে। পর মুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল ওটা। বাতাসের ক্রুদ্ধ হুংকার ছাপিয়ে বোট থেকে কাদের যেন আর্তনাদ শোনা গেল।

'বোটের ভেতর মানুষ আছে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'ওদের নিশ্চয় সাহায্য দরকার।'

নিজেদের বিপদের কথা ভুলে গেল তিন বন্ধু। পেছনের সীট থেকে রেইনকোট আর হ্যাট নিয়ে পরে ফেলল ঝটপট। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল কিশোর, তারপর দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল।

দরজায় বাতাসের প্রবল চাপ। খুলতে ভীষণ বেগ পেতে হলো। বাতাসের

তীব্র চাপে ফাঁকই করতে পারছে না দরজা। বহু কষ্টে বেরিয়ে এল ওরা গাড়ি থেকে। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। লক লোমোন্ডের বুকে সাদা ফেনা নিয়ে নাচানাচি করছে ঢেউ, খাঁড়ির ধারের ছোট ছোট নৌকাগুলোকেও সেই সাথে নাচাচ্ছে যেন খেপে গিয়ে।

তীরের দিকে পা বাড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা, ওল্টানো হাউসবোট থেকে তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। আটকে পড়া লোকগুলোকে রক্ষা করতে পারবে ওরা? অন্যান্য হাউসবোটে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো হাউসবোটে লোকজন নেই কিংবা ভয়ে বেরোচ্ছে না।

উল্টে যাওয়া বোটটার দিকে বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছে ওরা, হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল রবিন। ও ছিল সবার পেছনে। রবিন আর কিশোর পেছনে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

ভয়ঙ্কর ঝোড়ো বাতাস রবিনকে ঠেলতে ঠেলতে পানির ধারে নিয়ে গেছে। বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। তীরের একেবারে কিনারে চলে গেছে। সামলাতে পারল না কোনমতেই। ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল নিচের উত্তাল জলরাশির মধ্যে।

সাত

বন্ধুকে বিপদে পড়তে দেখে লক লোমোন্ডের তীব্র ঢেউয়ের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা ও কিশোর। রবিন বার দুই ভেসে ওঠার চেষ্টা করল। দু'বারই ঢেউয়ের নিচে চাপা পড়ে গেল।

সাঁতার কেটে তার কাছে চলে এল রবিন ও কিশোর। দু'দিক থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে। তীব্র স্রোতে দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল, পিছলে যেতে চায় পা। তিন বন্ধু পরস্পরের হাত ধরে এক সঙ্গে ফিরতে লাগল তীর লক্ষ্য করে।

তীরে উঠে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'অ-অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো,' কিশোর বলল। 'আমি আর মুসা হাউসবোটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।'

'না, না,' আপত্তি জানাল রবিন। 'আমি ঠিক আছি। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। বিপদে পড়া মানুষগুলোকে বাঁচাতে চাই।'

বাতাসের হুংকার ছাপিয়ে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। মাকে ডাকছে।

হাউসবোটের দিকে ছুটল ওরা। ওল্টানো বোটের একটা পাশ বেয়ে ওপরে উঠল অনেক কষ্টে। দরজা দেখতে পেল না কিশোর, একটা জানালা খুলল। জানালার চৌকাঠ দিয়ে নিচে ঝুঁকে তাকাল। দেখল আসবাব, বিছানা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিপরীত দিকের দেয়ালে। উল্টে যাবার কারণে দেয়ালটাই

এখন হাউসবোটের মেঝেতে পরিণত হয়েছে। দেয়ালের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে এক মহিলা। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসা ছোট একটা মেয়ে। ফোঁপাচ্ছে।

কিশোরের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল বাচ্চাটা। 'আমার আম্মু উঠছে না। ওকে ঘুম থেকে জাগাতে পারবে তোমরা?'

মেয়েটার মুখে শুকিয়ে আছে জলের দাগ। দেখে খুব মায়া লাগল কিশোরের। মনে মনে প্রার্থনা করল মহিলার যেন খারাপ কিছু না ঘটে।

'আমি আসছি, একটু রাখো,' কিশোর বলল। ডাক দিল দুই সহকারীকে। বাচ্চা আর তার মার অবস্থা বর্ণনা করল সংক্ষেপে। শেষে বলল, 'আমার হাত ধরো। তাহলে নিচে নামতে সমস্যা হবে না।'

মুসা আর রবিন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল, দু'পাশ থেকে দু'হাত ধরল কিশোরের, আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল ও।

মহিলার দিকে পা বাড়াল কিশোর। পরীক্ষা করে বুঝল অজ্ঞান হয়ে আছে মহিলা, শরীরের কোথাও হাড়-টাড় ভাঙেনি। বোট উল্টে যাবার সময় কোন কিছুতে মাথায় বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

'জানালার নিচে একটা টেবিল রাখছি আমি,' মুসা আর রবিনকে ডেকে কিশোর বলল। 'তোমাদেরকে তাহলে আর নিচে নামতে বেশি কষ্ট করতে হবে না।'

পাইনের শক্ত একটা টেবিল জানালার নিচে ঠেলে নিয়ে গেল কিশোর। রবিন প্রথমে নামল। তারপর মুসাকে নামতে সাহায্য করল ওরা।

বাচ্চাটা আবার কান্না জুড়ে দিয়েছে। এত লোক দেখে ভয় পেয়েছে বোধহয়। ওল্টানো একটা চেয়ারের পেছনে গিয়ে লুকাল। মুসা ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'চেরি গারবার। পী-প্লীজ আমার মাকে জাগাও না।'

'জাগাব,' ওকে ভরসা দিল মুসা। 'তুমি আগে চেয়ারের পেছন থেকে বেরিয়ে এসো। তারপর তোমার মাকে জাগানোর ব্যবস্থা করছি।'

মুসার নরম কণ্ঠ শুনে ভয় কেটে গেল বাচ্চাটার। দৌড়ে এল ওর কাছে। বিস্মিত গলায় বলল, 'দেখেছ, সব কেমন উল্টে আছে।'

'সব আবার আগের মত ঠিক হয়ে যাবে,' মিষ্টি হাসল মুসা।

এদিকে মিসেস আর্ডেনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে রবিন এবং কিশোর। কিশোর কব্জি আর ঘাড়ের পেছনটা হাত দিয়ে ম্যাসেজ করছে। রবিন স্টিমুল্যান্ট খুঁজছে। এক বোতল কর্পূর পেয়ে গেল ও। বোতলটা খুলে মিসেস আর্ডেনের নাকের নিচে ধরল। কর্পূরের ঝাঁঝাল গন্ধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরে পেল মহিলা।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে? আমি কোথায়?'

'আম্মু, আম্মু!' করতে করতে ছুটে এল চেরি, ঝাঁপিয়ে পড়ল মা'র কোলে।

একটু পরেই সব কথা মনে পড়ে গেল মিসেস আর্ডেনের। 'তোমরা আমাদেরকে বাঁচাতে এসেছ?' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমরা অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখেছ?'

'দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। ও সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মিসেস আর্ডেনের। 'এবার বাইরে যাওয়া যাক। বৃষ্টি নেই। বাতাসও থেমে গেছে। চলুন।'

ওই সময় জানালা দিয়ে উঁকি দিল এক লোক। ডাকল, 'মিসেস গারবার। আপনারা ঠিক আছেন তো?'

'আছি। এই ছেলেগুলো আমাদেরকে বাঁচিয়েছে।'

লোকটা খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। 'চেরি, তোমার আন্টিও এসেছে। নাও, হাত বাড়িয়ে দাও। আমি তোমাকে তুলে নিচ্ছি।'

মেয়েটাকে আলগোছে তুলে নিল লোকটা। তার স্ত্রীর কাছে চেরিকে দিয়ে এসে আবার জানালার সামনে দাঁড়াল। মিসেস গারবারকে জানালা গলে বেরোতে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। তারপর নিজেরা একে একে বেরিয়ে এল বাইরে। যে লোকটা চেরি আর তার মাকে একটু আগে বাইরে নিয়ে এসেছে তার নাম ব্রেক। ব্রেকের বউ তিন গোয়েন্দার কাকভেজা দশা দেখে বলল, 'আমাদের বাসায় চলো। জামা কাপড় শুকিয়ে নেবে।'

এ প্রস্তাবে না বলার কিছু নেই। ব্রেকদের হাউসবোটে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাউসবোট। সাজানো-গোছানো। স্টোভের আগুনে যে যার জামা কাপড় শুকিয়ে নিল ওরা। মুখ হাত ধুলো। চুল আঁচড়াল। মিসেস ব্রেকের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের দিকে তাকিয়ে।

'আরে তোমার তো ছবি দেখেছি ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায়,' বিস্ময় তার চেহারায়। 'এজন্যই তোমার নামটা চেনা চেনা লাগছিল। তুমিই তা হলে সেই বিখ্যাত কিশোর গোয়েন্দা?'

মুখ লাল হয়ে উঠল কিশোরের। প্রশংসার জন্যে নয়। স্কটল্যান্ডের মানুষও তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলেছে বলে। ভয় হলো ওকে এ ভাবে সবাই-ই হয়তো চিনে ফেলবে। তাহলে গোয়েন্দাগিরির কাজ সারা। শত্রুকে ধরা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে। তাকে দেখামাত্র কেটে পড়বে ওরা।

'তুমি তো রহস্য খোঁজো, না?' বলল মিসেস ব্রেক। 'এখানেও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবে। লক্ষ করেছ এদিকের শেষ হাউসবোটটা সারি থেকে অনেকটা দূরে?'

'না তো!' কিশোর বলল।

গলার স্বর ঝপ করে নেমে এল মিসেস ব্রেকের। 'ওই হাউসবোটে রহস্যময় লোকজনের আনাগোনা চলছে। হাউসবোটের মালিকরা বোধহয় বোটটা ওই লোকগুলোর কাছে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। তবে এখানকার কেউই রহস্যময় লোকগুলোকে চেনে না। ওরা বেশিরভাগ সময় রাতের বেলা আসে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, ওদের গাড়ি নেই।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর। সিদ্ধান্ত নিল রহস্যময় হাউসবোটে একবার ঢুঁ

মেরে আসবে। এ ব্যাপারে মিসেস ব্রেককে আরও কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু কয়েকজন প্রতিবেশী চলে আসায় সম্ভব হলো না। চেরি আর মিসেস গারবার এখন অনেক স্বাভাবিক এবং সুস্থ। ব্রেক পরিবার আর গারবারদের কাছ থেকে বিদায় নিল তিন গোয়েন্দা। তারপর পা বাড়াল সারির শেষ হাউসবোটের দিকে। ডক থেকে সরু ডেকে উঠে এল ওরা। জলযানটা ডেক দিয়ে ঘেরা। হাউসবোটের জানালা বন্ধ, ভেতরে পর্দা ফেলা। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। নক্ করেও লাভ হলো না। কারও সাড়া মিলল না। ডেকে বৃথাই হাঁটাহাঁটি করল ওরা, বাসিন্দাদেরকে সন্দেহ করার মত কোন সূত্র চোখে পড়ল না।

হোটেলে ফিরে এল ওরা। জামা কাপড় পাল্টাল। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। মুসা আর রবিন বিশ্রাম নিচ্ছে, কিশোর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাশেদ পাশার রুমে যাবে। বিকেলের অভিজ্ঞতার কথা বলবে চাচাকে।

ভুল করে প্রথমে যে ঘরটায় উঠে পড়েছিল, সেটার সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্যাগপাইপের শব্দ কানে এল কিশোরের। স্কটস হোয়া হেই গানের সুর।

থেমে দাঁড়াল কিশোর। বাজানো শুনেই বোঝা যায় বাদক নবিস লোক। বারবার প্রথম চরণটাই বেসুরো ভঙ্গিতে বাজিয়ে চলেছে।

'নির্ঘাত মিস্টার পেইশা,' ভাবল কিশোর। আলমারির ড্রয়ারে পাওয়া কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওতে ব্যাগপাইপের ছবিও ছিল।

চাচার ঘরের দরজায় নক করল কিশোর।

রাশেদ পাশা ঘরেই আছেন। খুলে দিলেন দরজা। হাতে সান্ধ্য পত্রিকা। কাগজটা কিশোরকে দেখিয়ে বললেন, 'নে, পড়।'

পত্রিকার প্রথম পাতায় ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে। ক্যাপশনে কিশোর গোয়েন্দার কথা বেশ ফলাও করে বলেছে।

ছবিটা দেখে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'ইস্! আবার সেই ছবি। পাবলিসিটি চাই না। তারপরও আঠার মত জিনিসটা যেন লেগেই আছে আমার পেছনে।'

হাউসবোটের ঘটনা চাচাকে খুলে বলল কিশোর। জানাল ওকে কিভাবে চিনে ফেলেছিল মিসেস ব্রেক। শেষে মন্তব্য করল, 'এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে গোপনে কিছুই করা যাবে না দেখছি।'

কিশোর গাড়ি দুর্ঘটনার কথাও জানাল চাচাকে। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা। 'লোকটা তোকে মারতে না চাইলেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে যে এই কাজগুলো করছে যদি জানতে পারতাম!'

'লেডি ওয়াগনারের হারানো জিনিসটার সঙ্গে এর যোগসূত্র না থেকেই পারে না,' জোর দিয়ে কিশোর বলল। 'চাচা, পুলিশে খবর দেব?'

কিছুক্ষণ ভাবলেন রাশেদ পাশা, তারপর বললেন, 'খবর দিয়েই বা কি লাভ? তোরা তো গাড়ির পুরো নম্বরটা নিতে পারিসনি। ড্রাইভারের চেহারাও দেখতে পাসনি। একটা কাজ কর। আজ আর হোটেলের ডাইনিং রুমে খেয়ে কাজ নেই। হোটেলের পাশেই একটা ফরাসী রেস্টুরেন্ট আছে। ভাল রান্না করে। ওখানে সাতটার সময় চলে যাব। একসঙ্গে ডিনার করব।'

'আচ্ছা, চাচা,' কিশোর বলল।

সন্ধ্যায় ফরাসী রেস্টুরেন্টে গেল ওরা। হেড ওয়েটারকে বলতে রেস্টুরেন্টের এক কোনায় নিয়ে বসাল সবাইকে। এখানে কেউ ওদেরকে বিরক্ত করতে আসবে না। তবে, কিশোর লক্ষ করল ওয়েটার আর একজন বয় বারবার চোরা চাহনিতে দেখছে ওকে।

কিশোরের সন্দেহ হলো ওরা বোধহয় ওকে চিনে ফেলেছে। খাওয়ার শেষ আইটেমটা চলছে, এই সময় বয় এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল।

'মঁশিয়ে, ওই দুই নম্বর টেবিলের ভদ্রলোক আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন,' কিশোরকে অনুরোধ করল সে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। অনুরোধ রক্ষা করবে না। কিম নামের লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। রকি বীচে একটা ছেলের মাধ্যমে দশ ডলার দিয়ে তার অটোগ্রাফ কিনেছিল লোকটা। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে। সেটা হাসিল করার জন্যে আর কাউকে অটোগ্রাফ দেবে না সে।

দ্বিতীয় টেবিলের দিকে তাকাল কিশোর, মিষ্টি হাসি ফুটল ঠোঁটে, এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল, বলল, 'দুঃখিত।'

রাশেদ পাশা বিল দিয়ে দিলেন। রেস্টুরেন্ট থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল চারজনে। হোটেলের পেছনের সিঁড়ি বেয়ে চলে এল নিজেদের ঘরে। কিশোরকে বললেন রাশেদ পাশা, 'কাল সকালে এডিনবার্গ যাব। রেডি হয়ে থাকিস। রজার ম্যাকলিন নামের সেই ড্রাইভারটাকেই আবার ভাড়া করেছি।'

পরদিন সকালে, হোটেল ছাড়ার আগে, কিশোর ডেস্কে গেল দেখতে মিস্টার পেইশা এখনও হোটেলে আছে নাকি চলে গেছে। ডেস্ক ক্লার্ক জানাল, 'উনি খুব ভোরে পাওনা মিটিয়ে চলে গেছেন হোটেল ছেড়ে।'

কিশোর অন্যদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে ভাবল, 'কেন জানি মনে হচ্ছে মিস্টার পেইশার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে আমার।'

রজার ম্যাকলিন ওদের দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। জানতে চাইল এডিনবার্গ যাবার আগে শহরের কোথাও ঘুরতে যেতে চায় কিনা।

কিশোর বলল, 'সময় থাকলে ব্যাগপাইপ ফ্যাক্টরি একবার ঘুরে দেখব কি ভাবে বানায়।' মুচকি হাসল সে। 'ফ্যাক্টরিতে গেলে বাঁশি বাজানোটা আরও ভালভাবে শিখতে পারব হয়তো।'

রাশেদ পাশা বললেন হাতে সময় আছে প্রচুর। ড্রাইভার ওদেরকে গ্লাসগোর কেন্দ্রবিন্দু বাণিজ্যিক এলাকায় নিয়ে এল। এখানেই ব্যাগপাইপের কারখানা। কারখানায় শুধু ব্যাগপাইপ নয়, যারা এ বাদ্যযন্ত্র বাজায় তাদের ইউনিফর্মও তৈরি করা হয়।

ওদেরকে পুরো কারখানা ঘুরিয়ে দেখাল গাইড। দেখাল ভেড়ার চামড়ার ব্যাগ। ওতে বাঁশিওয়ালা বাতাস ভরে রাখে। বাঁশি বাজানোর সময় ওটা প্রয়োজন হয়। ব্যাগটা পশমী কাপড় দিয়ে মোড়া।

এরপর ওদেরকে ব্যাগপাইপের কাঠের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো। যেটা

দিয়ে সুর তোলা হয় ওটাকে চ্যান্টার বলে, ওটার মাথায় একটা রীড থাকে। নিচের অংশে রবারের একটা ভালভ আছে, ব্যাগ থেকে বাতাস বের করতে না চাইলে ওটাকে বন্ধ করে দিলেই হলো। চ্যান্টার ছাড়াও ব্যাগপাইপটার আরও তিনটে পাইপ আছে। একসঙ্গে ওগুলোকে ড্রোন বলে। আলাদা আলাদা ভাবে দুটোর নাম টেনর, অপরটা ব্যাস।

গাইড ব্যাখ্যা করল, 'সব পাইপই বানানো হয় শক্ত আফ্রিকান ব্ল্যাক উড দিয়ে। পাইপ পরিষ্কার রাখা হয় যে হাতির দাঁত দিয়ে ওগুলো আসে ভারত থেকে, আর রীড-এর শর বা নল যা পাইপের মধ্যে থাকে, আনা হয় স্পেন থেকে। সবগুলো অংশ তারপর জোড়া লাগানো হয়।'

লম্বা, ফালি করা, ম্লান হলদে রঙের রীডগুলো সবচেয়ে আকর্ষণ করল কিশোরকে। শুনল নলগুলোকে খুব সাবধানে কাটা হয় যাতে ঠিকঠাক সুর আসে।

আরও কিছুক্ষণ ঘোরার পরে ব্যাগপাইপের কারখানা পরিদর্শন শেষ হয়ে গেল। গাইডকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এল ওরা। কারখানা থেকে বেরোতে বেরোতে মুসা মন্তব্য করল, 'এত কঠিন জিনিস শিখে কাজ নেই বাপু। তারচেয়ে আমার পিয়ানোই ভাল।'

গাড়িতে উঠল ওরা। রজার বলল 'স্টার্লিং ক্যাস্‌ল্‌ দেখবেন? খুব সুন্দর জায়গা। গেলে ভাল লাগবে।'

সমস্বরে ওরা জানাল স্টার্লিং ক্যাস্‌ল্‌ দেখতে যেতে কারও আপত্তি নেই।

দুর্গের কাছাকাছি এসেছে, রবিন মুগ্ধ গলায় বলল, 'কি বিশাল দুর্গ!' উঁচু পাহাড়ের ওপর পাথরের বিল্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে আছে আভিজাত্য আর গাম্ভীর্য নিয়ে।

রঙিন ঘাগরা পরা দুই গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল প্রবেশ পথের ধারে। ভেতরে ঢুকতে একজন গাইড ওদের দুর্গ দেখাতে নিয়ে চলল। ঢালু, খোয়া বাঁধানো ড্রাইভওয়ে চলে গেছে একটা প্লাজার দিকে। ওখানে সার বেঁধে দাঁড়ানো পাথরের বেশ কয়েকটা দালান।

'সবচেয়ে ছোট দালানটা এক সময় টাকশাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো,' হাত তুলে দেখাল গাইড। 'আশপাশের পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে আনা হতো রূপা। তা দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হতো। লোকে বলে ওই রূপা নাকি ছিল স্টার্লিং সিলভারের আদি উৎস।'

রাজারা থাকত যে সব ঘরে, সেগুলোর বিশাল আকার-আকৃতি। সুসজ্জিত ঘরগুলো দেখে গোয়েন্দারা রীতিমত মুগ্ধ। ছোট একটা ঘর ব্যবহার করতেন মেরী, স্কটল্যান্ডের রানী। ইংল্যান্ডের কারাগারে বন্দি হবার আগে এ ঘরেই থাকতেন তিনি। গাইড রাজা-রাজড়াদের নিয়ে এমন গল্প শুরু করে দিল যে তার বকবকানিতে রীতিমত মাথা ধরে গেল তিন গোয়েন্দার।

কিশোরের মনে ধরল দুটো নাম–দুই দেশী বীর উইলিয়াম ওয়ালেস এবং রবার্ট ব্রুস। মনে পড়ল তাঁদের সম্মানে স্কটস হোয়া হেই গানটা রচনা করা হয়েছিল।

শুধু কিশোররা নয়। দুর্গ দেখতে এসেছে আরও অনেকে। তাঁরা বাইরে চলে

গেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুসা। 'বেচারী রানীর জন্যে খারাপই লাগছে। বিশ বছর কারাগারে বন্দি! তারপর গলা কেটে হত্যা! ওহ্, ভাবা যায় না!'

ওদেরকে নিয়ে দুর্গের উঠোন পার হয়ে একটা পাথরের সিঁড়ির সামনে চলে এল গাইড। সিঁড়ি চলে গেছে নিচে, আন্ডার গ্রাউন্ডে। 'মাটির নিচের কারাগার দেখবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখলে ক্ষতি কি?' বললেন রাশেদ পাশা।

'তাহলে আপনারা দেখে আসুন,' বলল গাইড, 'আমাকে আপনাদের দরকার হবে না। আমি এখানে দাঁড়াই।'

ওরা চারজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। এখানে খুব ঠাণ্ডা। আর সেঁতসেঁতে। কারাগারের দূর প্রান্তে চলে এল ওরা। শিউরে উঠল মুসা। 'কি ভয়ংকর জায়গা! এখানে নিরীহ লোকজনকে বিনা দোষে বন্দি করে রাখা হতো ভাবতেই কেমন লাগছে। এখানে আর ভাল্লাগছে না। আমি গেলাম।'

ঘুরল মুসা, প্রায় দৌড়ে চলে এল বাইরে। ওর পেছন পেছন রাশেদ পাশা এবং রবিনও। মুচকি হাসল গাইড। 'গা ছমছমে জায়গা, তাই না?' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের আরেকজন সঙ্গী কই? সেই কিশোর গোয়েন্দা? ওনার ছবি উঠেছিল না কাগজে?'

এতক্ষণে খেয়াল করল সবাই, কিশোর ওদের সঙ্গে নেই।

'আমি যাই। দেখি কিশোর কি করছে,' বললেন রাশেদ পাশা।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে এলেন তিনি। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'কিশোরকে নিচে কোথাও দেখলাম না।'

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল গাইড। 'উনি অবশ্যই নিচে আছেন। ওনাকে ওপরে উঠতে দেখিনি আমি।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা, রবিন, রাশেদ পাশা। সিঁড়ি বেয়ে ছুটল নিচে। কি হলো কিশোরের? কোথায় সে?

আট

কিশোরকে না দেখে গাইডও চিন্তায় পড়ে গেল। সিঁড়ির শেষ মাথায় চলে এসেছেন রাশেদ পাশা, ওপর থেকে ডাকল সে, 'দাঁড়ান। আমি আসছি। একটা কথা বলব,' নেমে নিচে এল সে। বলল, 'আপনারা নিচে যাবার পরপরই একজন দর্শক নিচে গিয়েছিল। বিড়বিড় করে কি সব বলছিল। আমি শুধু শুনলাম, বলছে, এবার ওকে বাগে পাব আমি! এখন মনে হচ্ছে কিশোরের কথাই বলছিল সে। হয়তো···হয়তো ওকে সাফোকেশন চেম্বারে আটকে ফেলেছে।'

'কি!' এক সঙ্গে আঁতকে উঠল তিনজন।

গাইড জানাল ওরা প্রথম যে কামরায় ঢুকেছিল তার দেয়ালে ছোট একটা

ফোকর আছে। বহু আগে ওই কামরায় বন্দিদের ঢোকানো হতো। তারপর ফোকরটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হতো ওদের। সেই পাথরটা এখনও আছে ওখানে।

কথা শেষ করেই গাইড পড়িমরি করে ছুটল সাফোকেশন চেম্বারের দিকে। সেই সঙ্গে মুসা, রবিন এবং রাশেদ পাশাও। কামরায় ঢুকে দেখল পাথরটা পড়ে আছে মেঝেতে। তবে কিশোরের কোন পাত্তা নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাশেদ পাশা। 'খোদা! বাঁচা গেল! কিশোর হয়তো অন্য কোথাও আছে।'

আবার দৌড় দিল ওরা সিঁড়ির দিকে।

ওপরে উঠে ওদের বুক থেকে দেড়মনি পাথরটা নেমে গেল দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ ধরে কিশোরকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'তোমার জন্যে টেনশনে আমরা মরি। আর তুমি এখানে! কোথায় গিয়েছিলে?'

কিশোর জবাব দিল, 'তোমরা যখন কারাগারের ভেতরে ওই সময় একটা জিনিসের ওপর চোখ আটকে যায় আমার। ঠিক তখন একটা লোককে দেখি সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এগিয়ে আসছে আমার দিকে। লোকটা কে জানো? রকি বীচের সেই অটোগ্রাফ চোর কিম।'

'তুমি ঠিক দেখেছ?' রবিনের গলায় অবিশ্বাস ।

'অবশ্যই,' কিশোর বলল। 'আমাকে দেখামাত্র ঘুরে দাঁড়ায় সে, দৌড় দেয় পাগলের মত। আমি ওর পিছু নিয়েছিলাম কিন্তু ধরতে পারিনি। গেটের বাইরে দাঁড় করানো গাড়িতে এক লাফে উঠে পড়ে সে। দেখে মনে হলো লক লোমোন্ডের সেই গাড়ি যেটা আমাদেরকে চাপা দিতে চেয়েছিল। খুব দ্রুত চলে গেল গাড়িটা। তবে ড্রাইভারের সীটে বসা লোকটাকে চিনতে পেরেছি আমি ঠিকই। মিস্টার পেইশা ।'

'ওরা দু'জনে তাহলে মিতালি পাতিয়েছে,' বলল রবিন। 'আর মতলব ভাল নয় বোঝাই যায়।'

এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে কিশোরের গল্প শুনছিল মুসা। এবার গাইডের কথা বলল সে। গাইড যে একটা লোককে বিড়বিড় করে কি বলতে শুনেছিল। গম্ভীর গলায় শেষে যোগ করল, 'তুমি সাবধান না থাকলে ওই কিম ব্যাটা নির্ঘাত তোমাকে সাফোকেশন চেম্বারে আটকে ফেলত।'

মুখ বাঁকাল রবিন। 'যত সব হাস্যকর চিন্তা-ভাবনা। কিশোর, ওই লোক কেনই বা গুহার ভেতরে আসবে আর এলেও তোমার চোখে পড়ে যাবার ঝুঁকি কেন নেবে সে?'

'আমার ধারণা, রবিন, লোকটাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের কথা আড়ি পেতে শোনার জন্যে। তবে এভাবে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবে হয়তো ভাবতেই পারেনি সে।'

রাশেদ পাশা সন্দেহ করলেন শত্রুপক্ষ ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কভাবে লক্ষ করছে। 'মিস্টার পেইশাকে নিয়ে যে সন্দেহটা করেছিস মনে হচ্ছে তা মিথ্যা

নয়,' কিশোরকে বললেন তিনি। 'হোটেল রূমে তোদের কথা আড়ি পেতে শুনেছে সে। তাই আমরা রওনা হবার আগেই হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এখন থেকে কথা বলার ব্যাপারে সাবধানে থাকতে হবে তোদের।'

কিশোর পলাতক গাড়ির লাইসেন্স নম্বর টুকতে পেরেছে কিনা জানতে চাইলেন রাশেদ পাশা।

'পেরেছি,' কিশোর বলল। 'দুর্গে ঢোকার গেটে দাঁড়ানো এক গার্ডের সাহায্যে আমি পুলিশকে ফোন করেছিলাম। তারা নম্বর পরীক্ষা করে বলেছে গাড়িটা ভাড়া করা। এরপরে যা ঘটেছে, তাতে মনে হয় না ওরা ওই গাড়ি আর ব্যবহার করবে।'

রবিনের খুব রাগ হলো। 'আমরা যখনই কোন রহস্যের সমাধানের কাছাকাছি যাই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

'গেটের গার্ড কিমকে থামাল না কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

শ্রাগ করল কিশোর। 'খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ায় হয়তো সময় পায়নি গার্ড।'

ওরা ডোনাল্ডের গাড়িতে চড়ে বসল। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। হাসি-আনন্দে মেতে উঠল সবাই। রজার ম্যাকলিন এডিনবার্গের নানা দর্শনীয় জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল ওদেরকে। মজার মজার কৌতুক বলে হাসিয়ে মারল। সারা দিন চলে গেল ঘুরে-ফিরে, গল্প করে। সন্ধ্যা নাগাদ ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল রজার। গ্লাসগোর মত এ হোটেলটাও রেল স্টেশনের পাশে।

রজার ম্যাকলিনকে বিদায় দিতে খারাপই লাগছিল ওদের। আমুদে স্বভাবের লোকটা ভালই জমিয়ে রেখেছিল সারাটা দিন।

হোটেলের লবিতে ওরা চা-নাস্তা খেল। আরও খানিক গল্প-গুজব চলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। নিজেদের রূমে ঢুকছে সবে কিশোর, বেজে উঠল ফোন। রিসিভার কানে তুলল কিশোর। অপারেটর জানাল, ওভারসিজ কল অর্থাৎ স্কটল্যান্ডের বাইরে থেকে ফোন এসেছে। কয়েক সেকেন্ড পরে ফোনে যার সপ্রতিভ কণ্ঠ ভেসে এল, খুশি হলো কিশোর। 'টম!'

'তোমার জন্যে খবর আছে, কিশোর,' টম জানাল। 'পত্রিকায় তোমাকে নিয়ে আরটিকল লিখেছে যে লোকটা, তার খোঁজ পেয়ে গেছি। চাপ দিতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কিম নামে এক লোকের কাছে থেকে সে তোমাদের প্ল্যান জেনে নিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছি কিমের আসল নাম হলো কিম ব্রাগনার।'

'দারুণ!' উত্তেজিত শোনাল কিশোরের গলা। 'কিম সম্পর্কে কি কি জানো?'

'জানি, পুলিশের সঙ্গে কোন ঝুট-ঝামেলায় জড়ায়নি লোকটা। তাই বলে যে ভাল লোক, তা-ও নয়। তার কয়েকটা চেক ব্যাঙ্ক থেকে বাউন্স হয়ে ফিরে এলে আইনী ঝামেলায় আরেকটু হলেই ফেঁসে যাচ্ছিল এই কিম।'

'খাঁটি গোয়েন্দার মত কাজ করেছ দেখছি,' প্রশংসার সুর কিশোরের কণ্ঠে।

'আসল কথাটা তো এখনও বলাই হয়নি। যে তোমাদের ডাকবাক্সে বোমা

রেখে ভয় দেখাতে চেয়েছিল তাকেও খুঁজে বের করেছি আমি!'

নয়

উৎসুক হয়ে শুনছে কিশোর। হুমকি দিয়ে নোটটা যে লিখেছে তাকে কিভাবে সনাক্ত করেছে টম, সেটাও জানাল। 'লেখাটা দেখে তোমার মতই আমারও প্রথমে মনে হয়েছিল ওটা কোনও মেয়ের হাতের লেখা। হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টকে দেখানোর পর শিওর হয়েছি মেয়েমানুষের লেখাই। এক্সপার্ট জানাল বয়স্ক মহিলার হাতের লেখা। কাগজের ধরন দেখে ধারণা করলাম মহিলা শহরে, মধ্যবিত্ত কোনও এলাকায় বাস করে। আর তাহলে স্থানীয় দোকানে কেনাকাটা করতে আসবেই। ওসব জায়গার দোকানগুলোতে খুঁজতে শুরু করলাম।'

'এবং মহিলার খোঁজ পেয়ে গেলে তুমি?' অবাকই হলো কিশোর।

হাসল টম। 'হ্যাঁ, পেয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী অবশ্য একজন ছিল। আমার এক কাজিন। বিভিন্ন স্টোরে খদ্দেরদের ওপর চোখ রেখেছিলাম আমরা। তারপর একদিন পেয়ে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে।'

'আচ্ছা!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর।

'বয়স্কা মহিলারা কেনাকাটা করে যখনই ক্যাশে আসত, আমি আর আমার কাজিন বোমা হামলা নিয়ে কথা শুরু করে দিতাম। আর আড়চোখে লক্ষ করতাম তাদের প্রতিক্রিয়া,' একটু বিরতি দিল টম।

'তারপর?'

'এক দিন এক সুপার মার্কেটে বোমা হামলা নিয়ে কথা বলছি, দেখলাম এক বৃদ্ধার মুখ সাদা হয়ে গেছে, কাঁপছে সে। বুঝতে পারলাম অবশেষে আসল মানুষটিকে পেয়ে গেছি আমরা। জেরার মুখে স্বীকার করল বুড়ি সে-ই চিঠিটা রেখে এসেছিল তোমাদের ডাকবাক্সে।'

'তুমি সত্যি জিনিয়াস!' উৎসাহ দিল কিশোর। 'বলে যাও।'

'মহিলার নাম মিসেস হ্যাগার্ড। ঘর ভাড়া দিয়ে পেট চালায়। তাদের পাড়ায় অনেকেই ওরকম ঘর ভাড়া দিয়ে চলে। এক দিন মিসেস হ্যাগার্ড তার ঘরের জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছে হঠাৎ নিচ থেকে দু'জন লোকের গলা শুনতে পায় সে। গলির মুখে বুড়ির বাড়ি। প্রতিদিন বহু লোক ওই গলি দিয়ে আসা-যাওয়া করে। বুড়ি কাউকে তেমন লক্ষও করে না। তবে ওই লোক দুটোর প্রতি সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে তাদের কথাবার্তা শুনে। একজন বলছিল মিস্টার পেইশার কাছ থেকে নাকি নির্দেশ পেয়েছে একজন কিশোর গোয়েন্দা আর তার চাচা মিস্টার পাশাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে।'

'আর কি শুনেছেন মিসেস হ্যাগার্ড?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল কিশোর।

'ওটুকুই। আর শুনেছে মিস্টার পাশা ব্যবসায়ী, স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসা

আছে। মিসেস হ্যাগার্ড লোক দুটোকে দেখতে পায়নি। সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরেই তারা চলে যায়। বুড়ি বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবে কিনা। একবার ভেবেছিল পুলিশে ফোন করবে। পরে আর করেনি।

'তো কি করল মহিলা?'

'সুপার মার্কেটের ক্যাশিয়ারের কাছে খোঁজ নিল শহরে কোন কিশোর গোয়েন্দা থাকে কিনা। যখন শুনল কিশোর পাশা নামে একটা ছেলে আছে যে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তার চাচা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসা করে, স্বভাবতই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে পাশা বনাম পাশার মধ্যে এমন কি বিরোধ থাকতে পারে যার জন্যে একজন অপরজনকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চায়। পাশাদেরকে মহিলা ভেবেছিল একই পরিবারের লোক।'

'অবশেষে,' বলে চলল টম, 'মিসেস হ্যাগার্ড বেনামে ওই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেয়। সে-ই চিঠিটা তোমাদের ডাকবাক্সে রেখেছিল, তারপর বেল বাজিয়ে দ্রুত কেটে পড়েছিল।'

টমের গোয়েন্দাগিরির আবার তারিফ করল কিশোর। তারপর স্কটল্যান্ডে ওর অভিযানের কথা জানাল, বলল পেইশা নামের লোকটার কথা।

'এখন বুঝতে পারছি মিসেস হ্যাগার্ড পেইশা নামটার ভুল উচ্চারণ শুনেছিল,' কিশোর বলল। 'পেইশাকে পাশা শুনেছিল। অথবা পাশাকে পেইশা মনে করেছিল।'

টমকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল কিশোর। কি কি কথা হয়েছে জানার জন্যে মুসা আর রবিনের তর সইছে না। ওদেরকে পুরো ঘটনা খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'চাচাকে জিজ্ঞেস করব পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানাব কিনা।'

'জানানোর এখনই সময়,' বলল রবিন। 'পেইশা নামের ভয়ঙ্কর লোকটা তোমার ক্ষতি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সুযোগ পেলে সে তোমাকে খুন করেও ফেলতে পারে।'

'কিন্তু তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন সে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

শ্রাগ করল কিশোর। 'কি জানি। পেইশা লোকটা বোধহয় কোন গুণ্ডাদলের সরদার। হয়তো এমন কোন অবৈধ কাজ সে করছে, চাইছে না আমি বা চাচা তাতে নাক গলাই। হয়তো স্মাগলিং-এর কোন ব্যাপার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুসা। 'কোথায় ছোটখাট রহস্য দিয়ে শুরুটা হয়েছিল, এখন এর মধ্যে স্মাগলার, বোমা হামলার মত বিচ্ছিরি জিনিসও ঢুকে বসে আছে। খোদাই জানে সামনে আরও কি আছে!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর এবং রবিন। কিছুক্ষণ পরে রাশেদ পাশা ঢুকলেন ওদের ঘরে। ডিনার খেতে যাবেন। ওদেরকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। টমের ফোনের কথা চাচাকে জানাল কিশোর। পুলিশে খবর দেয়া উচিত–ওদের সঙ্গে একমত হলেন রাশেদ পাশা। ডিনার শেষে কিশোরই ফোন করল। পুলিশে খবর দিল। এ পর্যন্ত যা যা জেনেছে কোন কিছুই লুকাল না পুলিশের

কাছে। চীফ কনস্টেবল প্রতিশ্রুতি দিল মিস্টার পেইশাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবেন।

পর দিন সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন এল। কিশোরকে যেতে বলা হলো। গেল কিশোর। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'এখন পর্যন্ত মিস্টার পেইশার কোন খোঁজ আমরা পাইনি। তবে তোমার কথামত হাউসবোটে গিয়েছিলাম। হাউসবোটের বাসিন্দাদের সম্পর্কে যা যা সন্দেহ করেছ সেগুলো সত্যি হতেও পারে। তবে কাল সন্ধ্যায় গিয়ে হাউসবোটে কাউকে পাইনি। পড়শীরা বলল বিকেলের দিকে নাকি হাউসবোট থেকে অনেকগুলো বড় বড় বাক্স আর প্যাকেজ নামিয়ে ট্রাকে তোলা হয়েছে। হাউসবোটের বাসিন্দারা চলে যাবার আগে টাকা আর চিঠি রেখে গেছে। চিঠিতে লেখা ছিল টাকাটা হাউসবোটের ভাড়া হিসেবে দেয়া হয়েছে। আমরা ওখানে পৌঁছুতে দেরি করে ফেলি। তবে স্কটল্যান্ডের সমস্ত পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত, মিস্টার পেইশা এবং তার সঙ্গী কিম ব্রাগনারকে ধরা পড়তেই হবে।'

পর দিন ওয়াগনার এস্টেটে বিজনেস কনফারেন্স থাকায় সেখানে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। ছেলেরা ঠিক করল এডিনবার্গ ক্যাস্‌ল্‌ দেখতে যাবে। ট্যাক্সি ভাড়া করে রওনা হলো পাহাড়ের ওপরের দুর্গ দেখতে।

প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। একজনের পরনে ঝালরওয়ালা, শক্ত বোতাম লাগানো জ্যাকেট আর মাথায় দুই ফিতেওয়ালা সরু গ্লেনগারি ক্যাপ। অন্য জন পরছে রেজিমেন্টাল ট্রাউজার। গোয়েন্দাদের দেখে দুই সৈনিক হাসল। তিন গোয়েন্দা পাথুরে রাস্তা মাড়িয়ে রাজ প্রাসাদের উঠানে চলে এল।

প্রাসাদে ঘরের সীমা-সংখ্যা নেই। বেশিরভাগ ঘরে পুরানো অস্ত্রশস্ত্র আর রেজিমেন্টাল কোট ঝুলছে। কিশোর লক্ষ করল শোকেসগুলোর বেশিরভাগে ঘাগরা অনুপস্থিত। একজন গার্ড জানাল, ১৭৪৫ সালে, জ্যাকোবাইট বিদ্রোহের সময় বোনি প্রিন্স চার্লি স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে চলে যান, ক্ষমতায় আসে হাউস অভ হ্যানোভার। ওই সময় থেকে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে ঘাগরা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

'কাজটা করা হয়েছিল হাইল্যান্ডাররা যাতে স্কটিশ বংশধরদের কথা মনেও না আনে,' বলল গার্ড। 'এ প্রথা দীর্ঘদিন চলেছে। রাজা তৃতীয় রবিন সিংহাসনে বসার পরে আবার ঘাগরা পরার অনুমতি দেন।'

মুসা মন্তব্য করল, 'ঘাগরা পরার অনুমতি পেয়ে ভালই হয়েছে। ঘাগরা পরা পুরুষদেরকে ছবির মত লাগে দেখতে।'

রাজকীয় প্রাসাদের বেশির ভাগটা দেখা শেষ করে, সেন্ট মার্গারেট চ্যাপেল ঘুরে দেখল ওরা। তারপর গেল বিখ্যাত হলিরুড প্যালেসে। এ প্রাসাদের ভীষণ লম্বা, উঁচু আসনের দরবার ঘরে বসে অভিজাতরা স্কটল্যান্ড শাসন করতেন। ওখান থেকে ওরা গেল বিখ্যাত ধর্মযাজক এবং সমাজ সংস্কারক জন নক্সের বাড়িতে। পুরানো, চমৎকার একটা দালানে বাস করতেন জন নক্স। তাঁর বাড়ি বোঝাই প্রচুর

বই, চিঠিপত্র আর ধর্মীয় বক্তৃতার নথিপত্র। রবিন একটা বক্তৃতার কিছু অংশ পড়ে মন্তব্য করল, 'বোঝা যায় ইনি খুব জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন। তবে জন নক্স এখন বেঁচে থাকলে তার টানা দুই ঘণ্টার ধর্মীয় ভাষণ লোকে শুনত কিনা সন্দেহ আছে।'

জন নক্সের বাড়ি দেখে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ওরা। মুসা বলল তার খুব খিদে পেয়েছে।

সেইন্ট গাইলস ক্যাথেড্রালের পাশে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট দেখে ওতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পেটের কাজটা শেষ করে বেরিয়ে এল। হাঁটা দিল রয়াল মাইলের দিকে। ওদিক থেকে ওরা এসেছে।

মিনিট দুই চুপচাপ হাঁটল ওরা, হঠাৎ রবিন বলে উঠল, 'আমার ধারণা একটা লোক পিছু নিয়েছে আমাদের।'

পলকের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। লালচুলো, গোঁফওয়ালা একটা লোক সত্যি ওদের পেছন পেছন আসছে। লোকটার মুখে লাল-দাড়ি। পরনে ঘাগরা আর আকাশী নীল বালমোরাল।

'লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

'ঘুরে চলো সোজা লোকটার দিকে হেঁটে যাই,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'দেখি কি ঘটে।'

একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনেই। লোকটা পাশ কাটিয়ে গেল ওদের। মুখটা আরেক দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। কিছুটা রাস্তা যাবার পরে ঘুরল সে। আবার তিন গোয়েন্দার পেছন পেছন আসতে শুরু করল।

'রাস্তা পার হয়ে হলিরুডের দিকে আবার চলো সবাই,' পরামর্শ দিল কিশোর।

রাস্তার বিপরীত দিকে চলে এসেছে ওরা, লাল-দাড়িও পার হলো রাস্তা। আবার হাঁটা ধরল ওদের পেছনে। 'আরে, এ দেখছি কিছুতেই পিছ ছাড়ছে না,' বলল মুসা। 'এখন কি হবে?'

মুচকি হাসল রবিন। লোকটাকে কিশোরের চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারছে না। বলল, 'মনে হয় ছদ্মবেশ ধরেছে। ওর গোঁফ-দাড়ি দুটোই নকল মনে হচ্ছে আমার।'

দশ

'ওর দাড়ি-গোঁফ টেনে দেখতে পারলে হতো,' মুসা বলল।

'তা তো হতোই,' জবাব দিল রবিন। 'কিন্তু যাও না টান দিতে, কষে লাগিয়ে দেবে কয়েক ঘা। পিস্তল বের করলেও অবাক হব না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'এক কাজ করা যাক। আলাদা হয়ে যাই আমরা। মিলিত হব হলিরুড প্যালেসে। লোকটা একা তিনজনের পিছু নিতে পারবে না।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' মুসা বলল। 'লোকটা তোমার পিছু নিলে আমি আর রবিন ওর পিছু নেব।'

পরিকল্পনাটা ভালই ছিল। গোলমাল হয়ে গেল স্কটিশ ল-কোর্ট বিল্ডিং-এর কাছে এসে। লাল-দাড়ির পেছন পেছন আসছিল মুসা। হঠাৎ মুহূর্তে একটা দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ল লোকটা।

বুক ধক করে উঠল মুসার। দৌড় দিল লোকটা যে বিল্ডিং-এ ঢুকেছে, সেদিকে। কিন্তু গেটে দারোয়ান আটকে দিল মুসাকে। 'পাস আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।'

'তাহলে তো ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আজ বন্ধ। পাস ছাড়া ভেতরে ঢোকা নিষেধ।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মুসার। 'একটু আগে লাল রঙের দাড়িওয়ালা একটা লোককে ঢুকতে দেখলাম। সে কিভাবে ঢুকল?'

দারোয়ান কটমট করে তাকাল মুসার দিকে। 'তার কাছে পাস ছিল বলে ঢুকতে পেরেছে।'

এ লোককে অনুরোধ করেও লাভ হবে না বুঝতে পারল মুসা। গেটের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। কিন্তু লাল-দাড়ির কোন খবরই নেই। লোকটা কি এখানে নিজের কাজে এসেছিল? তাহলে ওদের অনুসরণ করছিল কেন?

অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের জবাব মিলল না। হতাশ হয়ে ফিরে চলল মুসা। চলে এল হলিরুড প্যালেসে। কিশোর আর রবিন অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

'কোন খবর আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। যা ঘটেছে খুলে বলল ওদেরকে। 'লোকটা পাস জোগাড় করল কি করে ভাবছি আমি,' রবিন মন্তব্য করল। 'হয় জাল পাস, নয়তো চুরি করা।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে কিশোরের মস্তিষ্কে। লোকটাকে এত চেনা চেনা লাগছিল কেন? কিন্তু চিন্তা করাই সার হলো। কোন উপসংহারে পৌঁছুতে পারল না। 'আমাদের আপাতত আর কিছু করার নেই।'

লাল-দাড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাসাদ দেখার দিকে মনোযোগ দিল তিন গোয়েন্দা। ১১২৮ সালে এটা তৈরি করা হয়। তখন ছিল মঠ। লালচে বাদামী রঙের পাথুরে কাঠামোটা এখনও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড দালানটাকে ঘিরে রেখেছে বিরাট এক বাগান আর উঁচু লোহার বেড়া।

ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল একজন গাইড। প্রতিটা ঘর সুসজ্জিত। জানা গেল গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান রাজ পরিবারের জন্যে প্রাসাদে বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ করা আছে। এডিনবার্গে বেড়াতে এলে এখানেই তাঁরা ওঠেন।

ডাইনিং রুম দেখে শিস দিয়ে উঠল মুসা। এত বড় ডাইনিং রুমও হয়! 'বাপরে বাপ! দুই মাথায় দু'জন একসঙ্গে খেতে বসলে কারও কথা কেউ শুনবে না।'

হাসল গার্ড। ওদেরকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তিন গোয়েন্দা চলে এল হোটেলে। রাশেদ পাশা তাঁর কাজ শেষ করে চলে এসেছেন।

চা খেতে খেতে সারাদিন কি কি ঘটেছে তার ফিরিস্তি দিল চাচাকে কিশোর। লাল-দাড়ির কথা শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল রাশেদ পাশার। বললেন, 'লোকটার আবার দেখা মিললে পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবি।'

'পরের বার সফল হবই,' দৃঢ়কণ্ঠে কিশোর বলল।

রাশেদ পাশা জানালেন তাঁর কনফারেন্স সফলই হয়েছে, তবে কাজ পুরোপুরি শেষ করতে আরও ক'টা দিন থাকতে হবে এডিনবার্গে।

'তোরা এই ফাঁকে ওয়াগনার হাউস থেকে ঘুরে আসতে পারিস,' পরামর্শ দিলেন তিনি। 'লইয়ারদের অফিসে এরিনা হিগিনস নামে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। খুব ভাল মেয়ে। ইনভারনেস-শায়ার এলাকাটা নিজের হাতের তালুর মত চেনে। ওর সঙ্গে ঘুরে আয় না।'

এরিনা হিগিনসের সঙ্গে ওই দিনই হোটেলে পরিচয় হলো কিশোরদের। ওদেরই বয়েসী। লম্বা। সুন্দরী। এক মাথা কালো চুল। বড় বড় নীল চোখ। কিশোরের দিকে ফিরে এরিনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছবি ফটোগ্রাফিক ইন্টারন্যাশনালের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'হ্যাঁ। আর সেজন্যেই তোমাদের দেশের সবার চোখে পড়ে যাচ্ছি আমি।' সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাগুলোর কথা মেয়েটাকে জানাল ও।

এরিনা বলল, 'তবে ইনভারনেস-শায়ারে লোক সংখ্যা কম। ওখানে তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

এক সঙ্গে ডিনার করল ওরা। ওদের সঙ্গে খুব দ্রুত মিশে গেল এরিনা। সে এমনই মেয়ে সবাইকে দ্রুত আপন করে নিতে পারে। ঠিক হলো পরদিন সকালে গাড়ি ভাড়া করে ওয়াগনার হাউস দেখতে যাবে ওরা।

কিশোর ওর রহস্যের কথা বলল এরিনাকে। জানাল রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। 'পদে পদে আমাদের বিপদ। কাজেই আমাদের সঙ্গে সত্যি যাবে কিনা ভাল করে ভেবে নাও।'

হেসে উঠল স্কটিশ মেয়েটা। 'বিপদ আর উত্তেজনা আমি খুব পছন্দ করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গে না যাবার কোন কারণ নেই।'

এক মহিলা যাচ্ছিল কিশোরদের টেবিলের পাশ দিয়ে, এরিনাকে দেখে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভাষায় কি যেন বলল, বুঝতে পারল না ওরা। মহিলা চলে যেতে ব্যাখ্যা করল এরিনা, 'মহিলা গেইলিক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

'মিষ্টি ভাষা তো!' কিশোর বলল। 'তুমি টানা বলতে পারো?'

'পারি,' বলল এরিনা।

কিশোর বলল, 'তাহলে আমাকে কয়েকটা শব্দ শিখিয়ে দিতে হবে। তবে এখন নয়। পরে। যাবার সময়।'

হাসল এরিনা। 'পরের দরকার কি? এখনই শিখে নাও না,' সে প্লেট থেকে একটা রুটি তুলে নিল। 'একে বলে অ্যারান।'

'অ্যারান মানে রুটি?'

'হ্যাঁ। কাল আমরা লং-এ করে যাব। লং মানে জাহাজ। তবে আমরা যে জলযানটাতে চড়ব সেটা একটা ফেরিবোট।'

কিশোরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'লং' শব্দটা সে হোটেলের আলমারির ড্রয়ারের কাগজে দেখেছিল। জিজ্ঞেস করল, 'এরিনা, মল কি কোন শব্দ?'

'হ্যাঁ। তবে সঠিক উচ্চারণ হলো মাওল। এর মানে হলো ধীর গতি।'

কিশোর ওর ব্যাগ খুলে নোটবই বের করল। কাগজের সেই অদ্ভুত মেসেজটা লিখল। এরিনা লেখাটা অনুবাদ করে দিল : হাইওয়ে ডিচ লক রড শিপ স্লো ওয়াইফ মেম্বার উইদাউট স্ট্যাম্প। বলল, 'স্ট্যাম্প মানে কোন কিছুর ছাপ বা প্রভাব।'

'আমি এখন শিওর,' কিশোর বলল, 'মেসেজটা আসলেই একটা কোড ছিল। "শিপ স্লো" দিয়ে নিশ্চয় লক লোমোন্ডের ওই হাউসবোটটাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে রহস্যময় লোকগুলো থাকত।'

'ঠিক বলেছ,' উত্তেজিত দেখাল রবিনকে। 'মেসেজটা মিস্টার পেইশার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। ওই লেখার মানে হতে পারে: কিশোর যদি এসে হাজির হয়, হাউসবোটের অধিবাসীরা যেন মালপত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ে।'

'এ সব বিবেচনা করে মনে হচ্ছে,' রাশেদ পাশা বললেন, 'বাক্সগুলোতে হয়তো চোরাই মাল ছিল।'

কিশোরও একমত হলো চাচার সঙ্গে। এ সবের পেছনে একটা স্মাগলিং র‍্যাকেট থাকা বিচিত্র নয়। গম্ভীর মুখে বলল, 'যে গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে চেয়েছিল মিস্টার পেইশাই ওটার ড্রাইভার ছিল । ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ফেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটানোর ইচ্ছে ছিল। না পেরে ফিরে গিয়ে তার লোকদের কেটে পড়তে বলেছে।'

রাশেদ পাশা চিন্তিত গলায় বললেন, 'তোদের সন্দেহ সত্য হলে বলতে হয় এ সবের সঙ্গে গেইলিক কোড মেসেজের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক হয়তো সত্যি রয়েছে।'

এগারো

স্থির দৃষ্টিতে গেইলিক কোড মেসেজটার দিকে তাকিয়ে আছে পাঁচজনে–রাশেদ পাশা, তিন গোয়েন্দা ও এরিনা।

অবশেষে এরিনা বলল, 'যে লোক এ কথাগুলো লিখেছে সে ভাষাটার সঙ্গে তেমন পরিচিত নয় বোঝা যায়। কারণ অনেক অশুদ্ধ শব্দ লিখেছে সে। মনে হচ্ছে ডিকশনারি দেখে লিখেছে। তাই সাজিয়ে লিখতে পারেনি।'

রবিন হাসল। 'ওয়াইফ মেম্বার উইদাউট স্ট্যাম্প' কথাটা দেখে ভেবেছিলাম এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কোন মহিলা রহস্যটির সঙ্গে জড়িত। ভিনদেশী কেউ, যে এ দেশে বৈধ নয়।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'তোমার ব্যাখ্যা ঠিকও হতে পারে। তোমাদের উচিত চোখ-কান খোলা রাখা, লক্ষ রাখা কোন মহিলা কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কিনা।'

কিশোর মুচকি হাসল। 'যদি তাই হয় এ ধরনের খেলায় রবিন আমাকে হারাতে পারবে না। আমার ধারণা, মেসেজের প্রথম দুটো শব্দ "হাইওয়ে ডিচ" দিয়ে বোঝানো হয়েছে মিস্টার পেইশা যাতে সুযোগ পেলে ধাক্কা মেরে আমার গাড়ি খাদে ফেলে দেয়।'

'সেই চেষ্টা করেওছিল সে,' মুসা জানাল এরিনাকে।

একটু পরে টেবিল ছাড়ল ওরা। এরিনা সবাইকে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। পরদিন সকালে, নাস্তার পরে দেখা করবে আবার।

পরদিন সকাল ন'টায় হোটেলে চলে এল এরিনা। কিশোররা চার সীটের একটা কনভার্টিবল ভাড়া করেছে। কিশোর আর তার চাচা গাড়ি ভাড়ার কাগজপত্রে সই করার পরে রেন্ট-আ-কারের লোক চলে গেল। এক পোর্টার গোয়েন্দাদের ব্যাগ তুলে দিল গাড়ির ট্রাঙ্কে। চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। গাড়ি ছেড়ে দিল।

এরিনার নির্দেশ মত গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। উত্তর পশ্চিমে, ফোর্ট উইলিয়াম শহরের দিকে ছুটে চলেছে।

'শুনলাম তোমার বাড়ি আইল অভ স্কাইটে,' এরিনাকে বলল মুসা। 'ভাল লাগে তোমার ওখানে?'

'অবশ্যই,' হাসি মুখে জবাব দিল এরিনা। 'তোমরা দেশে যাবার আগে আমার বাড়িতে একবার এসো। স্থানীয় ইতিহাসের গল্প আর উপকথা শোনাব।'

'এখনই বলো না,' অনুরোধ করল কিশোর। 'আইল অভ স্কাইতে বিখ্যাত কি কি জায়গা আছে?'

'একটা বিখ্যাত জায়গা হলো বোরেরেগ, ওখানে এক সময় ব্যাগপাইপ শেখানোর সবচেয়ে নাম করা কলেজটা ছিল। গোটা হাইল্যান্ড থেকে বাদকরা যেত ওই কলেজে ভর্তি হতে,' বলার সময় চোখ ঝলমল করতে লাগল এরিনার।

'ব্যাগপাইপ শেখানোর জন্য কলেজও ছিল নাকি?' কৌতূহল বোধ করল রবিন।

'ছিল। কয়েক'শ বছর আগে থেকেই ব্যাগপাইপ শেখানোর জন্যে অনেক কলেজ গড়ে উঠেছিল। বোরেরেগের কলেজে ম্যাকক্রিমন শেখানো হতো। অত্যন্ত অভিজাত একটা বিষয়। দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে।'

'ব্যাগপাইপের ইতিহাস এত বর্ণাঢ্য জানা ছিল না,' কনভার্টিবলটাকে ঝকঝকে একটা রাস্তা দিয়ে চালাতে চালাতে মন্তব্য করল কিশোর। রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড়।

'তবে ব্যাগপাইপের ইতিহাসের দাবিদার স্কটিশরা একা নয়,' জানাল এরিনা। 'মিশরে প্রথম ব্যাগপাইপ বাজানো হয় সাধারণ চ্যান্টার আর ড্রোন দিয়ে। পরে ওগুলো জোড়া লাগানো হয় চামড়ার ব্যাগের সঙ্গে এবং জুড়ে দেয়া হয় ব্লো পাইপের সাথে।'

'মিশর!' নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মুসা। হাসতে হাসতে বলল, 'ভাবা যায় রাজা তুতানখামেন ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছেন?'

হাসল এরিনা। 'তুমি হয়তো এখন কল্পনায় দেখবে অ্যারিস্টোটল এবং জুলিয়াস সিজারও ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছেন। গ্রীক এবং রোমানদের মাঝেও ব্যাগপাইপ বাজানোর রেওয়াজ ছিল। তারপর প্রথাটা কেলটিক আর রোমান হামলার কারণে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।'

'তাই যদি হয় তাহলে ওটাকে স্কটিশ যন্ত্র বলে কেন লোকে?' জানতে চাইল কিশোর।

ব্যাখ্যা করল এরিনা। 'আদি যন্ত্রটা ইউরোপের বিচ্ছিন্ন কোন কোন অঞ্চলে এখনও বাজানো হয়। তবে স্কটিশ হাইল্যান্ডে এর ইতিহাস ভিন্ন। আমাদের দেশের মানুষের ওই পাইপের সুর সাংঘাতিক পছন্দ ছিল। ক্লান্ত মানুষের মাঝে শক্তির সঞ্চার করত ব্যাগপাইপের সুর। তাদের বাদকদের নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না হাইল্যান্ড উপজাতির সর্দারদের।'

'বাজনার কথা শুনতে শুনতে আমার খিদে পেয়ে গেছে,' আচমকা বেরসিকের মত বলে উঠল মুসা। 'খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠল তিনজনেই। এরিনা বলল কাছেই একটা ভাল হোটেল আছে। ওখানে লাঞ্চ করা যাবে।

সুসজ্জিত হোটেলের বিশাল ডাইনিং রুমে ঢুকে পেট পুরে খেল ওরা। তারপর বেরিয়ে পড়ল আবার।

দু'পাশে বনভূমি আর পাহাড় সারির মাঝ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। মাইলের পর মাইল সবুজ তৃণভূমিও চোখে পড়ছে। মাঠে মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে গরু-ছাগল আর ভেড়ার দল। খানিক পরে কিশোর লম্বা, সরু একটা জলধারার সামনে এসে পৌঁছুল। এরিনা জানাল এটা লক লেভেনের একটা বাহু বা শাখা।

ছোট্ট গ্রাম বাল্লাহুলিশে ঢোকার পরে এরিনা বলল, 'এখান থেকে ফেরিতে চড়ে ইনভারনেস-শায়ারে ঢুকব। গাড়িতে গেলে লক লেভেনের শাখা ঘুরে যেতে হবে। অনেক সময় লাগবে।'

ফেরিঘাটে সবার আগে কিশোরের গাড়ি পৌঁছুল। একটু পরে অন্যান্য যানবাহন আসতে শুরু করল। ফেরির চেহারাও দেখা গেল কয়েক মিনিট বাদে।

ছোট, সমতল একটা ডেক আছে ফেরিতে। ফেরি চালক এবং তার সহযোগীর জন্যে ছোট্ট একটা কেবিনও আছে। নদীতে তীব্র স্রোত। জেটিতে বাঁধা

হলো ফেরি। গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক বেয়ে প্রথমেই উঠল কিশোরের গাড়িটা। তারপর পর পর আরও তিনটা গাড়ি। আর জায়গা নেই। ছেড়ে দিল ফেরি।

'দারুণ, না!' নদীর বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে মন্তব্য করল মুসা।

শাখা নদীর ওপারে পৌঁছুতে বেশি সময় নিল না ফেরি। তীরে পৌঁছার পরে গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক আবার নামিয়ে দেয়া হলো। ফেরি চালক ইশারা করল কিশোরকে ড্রাইভ করতে। তীর ঘেঁষা খোয়া বিছানো রাস্তা, দু'ধারে কোন রেলিং নেই, দু'পাশেই, নিচে নলখাগড়ার ঝোপ মুখ উঁচিয়ে আছে।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

কিশোর গাড়ির আয়নার দিকে তাকাল এক ঝলক। পেছনের গাড়িটা স্টার্ট নিয়েছে। ড্রাইভারের সীটে বসা সেই লাল-দাড়ি। পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে বসল সে। কিশোরের হাতে ঝাঁকি খেল স্টিয়ারিং হুইল। সে কিছু করার আগেই ধাক্কার চোটে শূন্যে উঠে গেল ওদের কনভার্টিবল গাড়ি।

ঝাঁকি খেয়ে কনভার্টিবলের যাত্রীরা ছিটকে পড়ে গেল পানিতে, শুধু কিশোর ঝুলে রইল হুইলের সঙ্গে, নিজের সীটে। খাড়াভাবে গাড়িটা পড়ল চার ফুট গভীর পানিতে।

দৃশ্যটা দেখে হায় হায় করে উঠল সবাই। থেমে গেল অন্যান্য গাড়ি, লোকজন ছুটল ওদেরকে রক্ষা করতে। সম্পূর্ণ কাকভেজা হয়ে, গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় তীরে উঠে এল মুসা, রবিন এবং এরিনা। কিশোরের কোমর পর্যন্ত ভিজে গেছে।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল একজন লোক। হ্যাঁচকা টানে জুতো-মোজা খুলে প্যান্টের নিচের অংশ হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিল সে। তারপর লাফ দিয়ে নামল পানিতে। সাঁতার কেটে চলে এল কিশোরের কাছে।

ভয় কেটে গেছে কিশোরের, তবে এখনও অল্প অল্প কাঁপছে। লোকটার বাড়ানো হাত ধরল ও। 'থ্যাংক ইউ!' তারপর নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু গাড়িটাকে পানি থেকে তুলি কিভাবে?'

'পানি থেকে তুললেও ও গাড়ি এখন আর চালাতে পারবে না তোমরা,' হাসল স্কটিশ লোকটা। 'তবে তোমাদের গাড়ি তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। কয়েকজন মিলে হাত লাগালেই হয়ে যাবে। বেশি ভারী নয় গাড়িটা।'

এ ভাবে সাহায্য করার জন্যে লোকটাকে আবারও ধন্যবাদ দিল কিশোর। বলল, 'তবে আপনাকে আর পেরেশানি করতে চাই না। এদিকে রেকার পাওয়া যাবে গাড়িটা তোলার জন্যে?'

'তা পাওয়া যাবে,' বলল লোকটা। 'তোমরা বললে আমি একটা জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'পারলে খুব ভাল হয়,' বিনীত সুরে কিশোর বলল।

ওদিকে বাকি তিনজন রাগে গজগজ করছে। বিশেষ করে মুসা। 'লাল-দাড়ি শয়তানটার জন্যেই এ অঘটনটা ঘটল!' ফুঁসে উঠল সে।

এমন সময় এক মহিলাকে ডকে উঠে আসতে দেখা গেল। ওদের দিকে

তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন তিনি। নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস কারগুনার বলে।

'তোমরা কেউ আহত হওনি দেখে স্বস্তি বোধ করছি,' বললেন তিনি। 'গাড়িটার জন্যে অবশ্য খারাপই লাগছে। আমার গোলাবাড়িটা এখান থেকে দূরে নয়···বেন নেভিস পাহাড়ের ঠিক নিচে। আমি একা থাকি। তোমরা আজকের রাতটা আমার সঙ্গে কাটালে খুশি হব। কাল সকালে যেখানে যাবার যেয়ো। অবশ্য কাল সকালের আগে তোমাদের গাড়ি ঠিক হবে কিনা সন্দেহ।'

মহিলার বদান্যতার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিল ওরা। মুসা বলল, 'আপনার বাড়ি যেতে আপত্তি নেই আমাদের। তবে আগে আমাদের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে হবে,' কিশোরকে দেখাল সে।

ফেরির অন্যান্য গাড়িগুলো ফেরি পার হতে শুরু করেছে। জেটি থেকে বেরোনোর পথে দাঁড়িয়ে রইল রবিন। একেকটা গাড়ি যাচ্ছে আর ড্রাইভারকে হাত তুলে থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে অ্যাক্সিডেন্ট যে ঘটিয়েছে ওই লোকটাকে দেখেছে কিনা কিংবা লাইসেন্স নম্বর টুকেছে কিনা। কেউই 'হ্যাঁ' বলতে পারল না।

অ্যাক্সিডেন্ট দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কেউ লক্ষ করেনি কে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। তবে একজন বলল অপকর্মের হোতা অ্যাক্সিডেন্ট করেই গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

কিশোরকে ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তীরে। 'আমি ঠিক আছি,' বন্ধুদেরকে আশ্বস্ত করল সে। মিসেস কারগুনারের দাওয়াতের কথা শুনে বলল, 'আপনার বাড়িতে বেড়াতে পারলে ভালই লাগবে আমাদের।'

যে লোকটা কিশোরকে তীরে উঠতে সাহায্য করেছে সে গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে এল। এয়ারটাইট কমপার্টমেন্ট বলে ব্যাগ-ট্যাগের কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু সুটকেসগুলো সামান্য ভিজে গেছে। জেটিতে তোলা হলো সবগুলো ব্যাগ আর সুটকেস। জেটির লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওগুলো বয়ে নিয়ে এল তীরে।

মিসেস কারগুনার আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিলেন কিশোরকে। এরিনার দিকে ফিরে গেইলিক ভাষায় কি যেন বললেন। জবাবে হাসল এরিনা। কিশোরকে বলল, মিসেস কারগুনার জানতে চাইছেন পত্রিকার পাতায় যে কিশোর গোয়েন্দার ছবি তিনি দেখেছেন সেই ছেলেটি আর কিশোর একই লোক কিনা।

হাসল কিশোর। 'কাদা মেখে ভূত হয়ে গেছি। তারপরও আমাকে চিনে ফেলেছেন।'

রেকারে করে সরিয়ে নেয়া হলো কিশোরদের কনভার্টিবল। মিসেস কারগুনার ওদেরকে নিয়ে পা বাড়ালেন নিজের গাড়ির দিকে। লাগেজগুলো বনেটে রাখা হলো। তারপর পাঁচজন চড়ে বসল গাড়িতে।

মিসেস কারগুনারের গোলাবাড়ি একতলা একটা বিল্ডিং। তাতে অনেকগুলো ঘর। ওদেরকে দুটো বেডরুম দেখিয়ে দিলেন মিসেস কারগুনার। মস্ত বিছানা পাতা। ওপরে পেতে রাখা হয়েছে রঙিন চাদর, পায়ের কাছে ভাঁজ করা কম্বল। কিশোরদের তিনজনকে একটা ঘরের বিছানা ভাগ করে নিতে হলো। আর এরিনা

মেয়ে বলে আলাদা একটা ঘর পেল।

গোসল-টোসল সেরে, ধোয়া জামা-কাপড় পরে যখন ফ্রেশ হয়ে নিল ওরা, ততক্ষণে রাতের খাবার রেডি করে ফেলেছেন মিসেস কারগুনার। প্রথমে পরিবেশন করা হলো পেঁয়াজের সুপ, সাথে সেদ্ধ করা মুরগী। তারপর এল ভেড়ার মাংসের স্টু–আলু আর সাদা শালগম মেশানো। সেই সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারী। রুটি তো আছেই। সবশেষে ধোঁয়া ওঠা ব্রেড পুডিং, তাতে কিশমিশ এবং কাস্টার্ড সস মেশানো।

'দারুণ খেলাম,' মস্ত ঢেকুর তুলল মুসা। 'গলা পর্যন্ত ভরে গেছে। এ রকম যদি মাত্র দুই বেলা খাওয়ান, চিরকাল থেকে যাব আপনার বাড়িতে।'

হাসলেন মিসেস কারগুনা। 'তোমরা তো এখনও ট্রিকল ডোডিই খাওনি।' এক বয়াম বাদামী রঙের, আঠাল ক্যান্ডি নিয়ে এলেন মিসেস কারগুনার। মিষ্টি ওরা সবাই পছন্দ করে। কাজেই খেতে আপত্তি করল না কেউ।

খাওয়ার পরে প্লেট-বাসন মাজতে মিসেস কারগুনারকে সাহায্য করল চারজনেই। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গল্পগুজব করল খানিকক্ষণ। শেষে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গভীর রাতে হঠাৎ ব্যাগপাইপের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। দূর থেকে আসছে। সুরটা শুনেই চিনে ফেলল। স্কটস হোয়া হেই বাজাচ্ছে কেউ। তবে সুরটা বেসুরো।

এত রাতে কে বাঁশি বাজায় দেখার জন্যে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল কিশোর। দ্রুত পরে নিল জামা কাপড়, তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। ভারী কুয়াশার চাদরে ঢাকা প্রকৃতি। তবে কিশোর নিশ্চিত দূরের কোনও পাহাড় থেকে আসছে বাঁশির শব্দ।

গোলাবাড়ির সামনে, একটা বেঞ্চিতে বসে বাঁশি শুনবে বলে ঠিক করেছে কিশোর, এমন সময় একটা ট্রাক আসতে দেখল বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল ওটা। কিশোর শুনতে পেল ট্রাকের ভেতর থেকে ভেড়া ডাকছে।

ভেড়া! ট্রাক!

টমের কথা চট করে মনে পড়ে গেল কিশোরের। ও বলেছিল স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে ইদানীং খুব বেশি ছাগল আর ভেড়া চুরি যাচ্ছে।

এই ট্রাকটা কি ভেড়াচোরদের দলের কারও?

বারো

কিশোর ছুটে গেল সামনে, চোখ কুঁচকে ট্রাকের লাইসেন্স নম্বর পড়ার চেষ্টা করল।

সেই মুহূর্তে ট্রাকটাকে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দিল দুই ছায়ামূর্তি। দৌড়ে আসছে তারা। ওদের জন্যে দ্রুত ধাবমান ট্রাকটাকে আর দেখতেই পেল না কিশোর।

কাছে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

'কিশোর, তুমি আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' অভিযোগ করল মুসা। 'দরজা খুলে বেরোনোর শব্দ পেলাম। তারপর আর ফিরে আসছ না দেখে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখানে কি করছ?'

কিশোর দ্রুত ঘটনাটা জানাল ওদেরকে।

'ভেড়াচোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কিশোর কিছু বলার আগেই হঠাৎ দূরে শিস দিল কে যেন। কয়েক সেকেন্ড বিরতি। আবার শোনা গেল শিসের শব্দ। এভাবে বিরতি দিয়ে এক মিনিট ধরে চলল শিস দেয়া।

'ওটা আবার কি?' অবাক হলো মুসা।

কিশোর বলল, 'ব্যাগপাইপের শব্দ।'

'ব্যাগপাইপে শিস দেয়া যায় জানতাম না তো,' বলল মুসা।

'নাকি কেউ কোন সঙ্কেত দিচ্ছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি,' চিন্তিত গলায় কিশোর বলল। হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

মিসেস কারগুনার এবং এরিনা দু'জনেই ঘুমে বিভোর। এত কিছু ঘটে গেছে টেরই পায়নি। পরদিন সকালে ব্যাগপাইপ আর ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার ঘটনা ওদেরকে খুলে বলল কিশোর। এরিনা বলল চ্যান্টারের রীড দিয়ে যে কোন সুর তোলা সম্ভব। সেটা শিসের মতও হতে পারে।

'কিন্তু কে শিস দিল, কেন দিল, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল এরিনা।

জবাবে কিশোর কিছুই বলল না। ওর খুঁতখুঁতে গোয়েন্দামন বলছে গভীর রাতে শিস বাজানোর পেছনে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে। কারণটা কি খুঁজে বের করতে হবে।

ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার সম্ভাবনার ব্যাপারে কিশোরদের সাথে একমত মিসেস কারগুনার। তিনি তাড়াতাড়ি ফোন করে পড়শীদের জানিয়ে দিলেন গতরাতের ঘটনা। তারপর কিশোরদেরকে বললেন, 'রাখালরা এক্ষুণি তাদের কুকুর নিয়ে ভেড়াচোরদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। তোমরা যাবে নাকি দেখতে?'

'এ সুযোগ পেলে কে ছাড়ে?' কিশোর বলল। 'ভাল কথা। পুলিশে খবরটা দেয়া উচিত না?'

মিসেস কারগুনার বললেন, 'উচিত। তবে চোরেরা কখনও এক জায়গায় দু'বার চুরি করতে যায় না। ট্রাকটাকে যেহেতু তুমি ভাল করে লক্ষই করতে পারোনি কাজেই মনে হয় না পুলিশকে জানিয়ে কোন লাভ হবে। আন্দাজে ভর করে পুলিশ কিছু করতে পারবে বলে ভরসা হয় না।'

রবিন বলল, 'কিশোর, তুমি তো শুধু একবার ভেড়ার ডাক শুনতে পেয়েছ।

এমনও তো হতে পারে ট্রাকের ভেতর ওই একটাই ভেড়া ছিল।'

কিশোরও একমত হলো, তা হতে পারে। ওই ট্রাকে যে সত্যি ভেড়া পাচার হচ্ছিল সে-ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও। কারণ নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ তার হাতে নেই।

নাস্তা সারার পরে মিসেস কারগুনার কিশোরদেরকে পথ বাতলে দিলেন কোন দিকে গেলে মেষপালক আর তাদের কুকুরগুলোর দেখা মিলবে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। একটা পাহাড়ের ধারে এসেছে, দেখল এক মেষপালক, পরনে শিকারীর পোশাক, কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা ভেড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ হতে দিচ্ছে না। কেউ দলছুট হবার চেষ্টা করলেই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে পালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এরিনা জানাল এটাকে ইংরেজীতে বলে শেডিং।

কিশোররা খুব মজা পেল দৃশ্যটা দেখে। কি চমৎকার ভাবে ভেড়ার দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কুকুরটা। কোন ভাবেই ছত্রভঙ্গ হতে দিচ্ছে না। কেউ সে চেষ্টা করলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে ছুটে যাচ্ছে তার দিকে। এক রকম কানে ধরে বাধ্য করছে পালের সঙ্গে মিশে থাকতে।

ভেড়ার লেজে লাল রঙের ফুটকি দেখে এরিনার কাছে জানতে চাইল মুসা ওগুলো কি।

'ওই চিহ্ন দিয়ে যে যার ভেড়ার পালকে চিনে রাখে মেষপালকরা,' জবাব দিল এরিনা। 'কারও ভেড়ার লেজে থাকে লাল দাগ, কারওটা নীল।'

মেষপালকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। লোকটা গর্বের সাথে জানাল এ তল্লাটে তার কুকুরটাই সেরা। 'ভেড়া খুব ভাল চেনে আমার ডারবি। যে কোন ভেড়াকে দলের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে আসতে বলি, নিয়ে আসবে। এজন্যে কয়েকবার পুরস্কারও জিতেছে ও। দেখবে?'

'অবশ্যই,' এক যোগে বলে উঠল ওরা।

ওদেরকে ভেড়ার পাল থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল মেষপালক। তারপর পালের মধ্যে ঢুকে একটা ভেড়ার মাথায় হাত রাখল। এবার ফিরে এল কিশোরদের কাছে।

'ডারবি,' তার কুকুরটাকে ডাকল সে। 'ওই ভেড়াটাকে ধরে নিয়ে আয় তো।'

রকেটের গতিতে ছুটল ডারবি। ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ভেড়ার পালের মধ্যে। তারপর কোনটার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিল, কয়েকটার পায়ে গুঁতো মারল নাক দিয়ে। ভেড়াগুলো ধাক্কা আর গুঁতো খেয়ে দুপাশে সরে গেল। পালের মাঝখানে তৈরি হয়ে গেল একটা রাস্তা। নির্ধারিত ভেড়াটাকে তাড়া করল তখন ডারবি। ভেড়াটা তাড়া খেয়ে ছুটল। চলে এল মেষপালকের কাছে। সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটতে সময় নিল এক মিনিটেরও কম।

'দারুণ,' হাততালি দিল কিশোর।

হঠাৎ জ্যাকেটে টান পড়তে নিচে চেয়ে দেখে ছুটে আসা ভেড়াটা ওর জ্যাকেটের একটা বোতাম চিবুতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা দেখে হেসে ফেলল কিশোর। জ্যাকেট ছাড়িয়ে নিল ভেড়ার মুখ থেকে।

মেষপালকও হাসল। 'লোকে বলে ছাগলে কি না খায়। আমি বলি ভেড়ায় কি

না খায়। কোন কিছুতেই ওদের অরুচি নেই।'

মেষপালককে ওরা ধন্যবাদ দিল মজার একটা খেলা দেখানোর জন্য। তারপর ফিরে এল মিসেস কারগুনারের বাড়িতে। মিসেস কারগুনার জানালেন আগের রাতে কাছের এক খামার থেকে অনেকগুলো ভেড়া চুরি হয়ে গেছে।

'অনেকগুলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'তুমি যে ট্রাকটা দেখেছ তার মধ্যে অনেকগুলো ভেড়ার জায়গা কি হবে, কিশোর?'

'তা হবে,' কিশোর বলল। 'আমার ধারণা, ভেড়াগুলোকে ওষুধ খাইয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ট্রাকে তোলা হয়েছিল। একটা ভেড়ার হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওটারই ডাক শুনেছি আমি।'

'কি নিষ্ঠুর লোক!' শিউরে উঠল রবিন।

মিসেস কারগুনারের চেহারা কঠোর দেখাল। 'চোরের মনে কি আর দয়ামায়া থাকে?' কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তবে তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিশোর। পুলিশকে জানানো দরকার।'

'পুলিশ হয়তো আমার যুক্তি অবাস্তব বলেই উড়িয়ে দেবে,' কিশোর বলল। 'এখনই পুলিশকে জানিয়ে কাজ নেই। আগে হাতে প্রমাণ পাই। তারপর খবর দেবেন।'

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। মিসেস কারগুনার ফোন ধরলেন। দু'একবার হুঁ-হ্যাঁ করে রেখে দিলেন। কিশোরকে বললেন, 'তোমাদের গাড়ি রেডি। তবে তোমরা আরও ক'টা দিন থেকে গেলে ভাল লাগত আমার। কিন্তু জোর করেও লাভ হবে না জানি। চলো, তোমাদেরকে গ্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিদায় নেয়ার সময় মিসেস কারগুনারকে টাকা সাধতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গেল কিশোর। কিছুতেই টাকা নেবেন না তিনি। অতিথিদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নিতে পারবেন না সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন। গ্যারেজেও একই ঘটনা ঘটল। গাড়ির মিস্ত্রি শত সাধাসাধিতেও টাকা নিল না। তার এক কথা, কিশোররা তাদের অতিথি। আর তাদের দেশে বেড়াতে এসে যে ওরা অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছে এটাই বরং হাইল্যান্ডারদের জন্যে লজ্জার ব্যাপার। তার ওপর আবার অতিথিদের কাছ থেকে সামান্য গাড়ি মেরামতির জন্যে পয়সা নেয়া? প্রশ্নই ওঠে না।

কিশোর টাকা দেয়ার জন্যে জোরাজুরি করছে দেখে এরিনা কানে কানে বলল, 'আর কিছু বোলো না। তাহলে এরা অপমান বোধ করবে।'

মিসেস কারগুনার বিদায় বেলায় কিশোরের হাত ধরে বললেন, 'চুরি যাওয়া ভেড়ার রহস্য যদি সমাধান করতে পারো তাহলেই আমাদের অনেক পাওয়া হবে।'

গাড়িতে চড়ে বসল ওরা। এখন ওটা চকচক করছে। ফোর্ট উইলিয়ামের রাস্তা ধরল ওরা। শহরে পৌঁছে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখল আগে তারপর হোটেলে ঢুকল লাঞ্চ করতে।

লাঞ্চ শেষে এরিনা একটা মিউজিয়ামে নিয়ে গেল ওদেরকে। দেখার মত অনেক কিছুই আছে সেখানে। তবে ওদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা

অদ্ভুত কায়দায় আঁকা ছবি।

ছোট্ট, গোলাকার তৈলচিত্রটা একটা টেবিলের ওপর চিৎ করে রাখা। সরাসরি তাকালে মনে হয় কিছু এলোমেলো রঙের ছোপ। ছবির মাঝখানে খাড়া করে রাখা সিলিন্ডারের মত একটা টিউব। সিলিন্ডারের গায়ে আয়না বানানো। সেই আয়নার ভেতরে ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে। ওটার দিকে তাকালে তবে গিয়ে ছবিটা বোঝা যায়। জর্জিয়ান কাপড় পরা এক সুদর্শন তরুণের ছবি।

'উনি আমাদের বিখ্যাত বোনি প্রিন্স চার্লি,' জানাল এরিনা। 'রাজা দ্বিতীয় জেমসের নাতি, ওল্ড প্রিটেন্ডারের ছেলে, যিনি ফ্রান্সে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। ১৭৪৫ সালে তরুণ চার্লস ফিরে আসেন স্কটল্যান্ডে। হাইল্যান্ডারদেরকে জড়ো করেন তাঁর পতাকার নিচে। কালুডেন মূরের যুদ্ধে করুণ পরাজয় ঘটে তাঁর। পালিয়ে চলে যান পাহাড়ে।

'স্কটল্যান্ডের অনেকেই পছন্দ করত প্রিন্সকে। চাইত যুদ্ধে জিতে সিংহাসনে আবার বসবেন। এদের একজন ছিলেন ফ্লোরা ম্যাকডোনাল্ড। তিনি রাজপুত্রকে তাঁর পরিচারিকার ছদ্মবেশে ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।'

'দারুণ রোমান্টিক তো!' বিড়বিড় করল মুসা। 'প্রিন্স কিন্তু দেখতে সত্যি সুন্দর!'

হাসল এরিনা। 'হ্যাঁ। তবে ইতিহাস বলে বাহান্ন বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি।'

'তারমানে তিনি বুঝিয়ে দিলেন বিয়ে করার জন্যে বয়স কোন বাধা নয়,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা।

ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল রবিন।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, এরিনা বলল, 'তোমরা তো এখন ওয়াগনার হাউসে যাবে। কাজেই আমার ডিউটি শেষ। আমি এখন বাড়ি ফিরে যাই?'

কিন্তু কিশোররা কেউই ওকে ছাড়তে চাইল না।

'খুব বেশি তাড়া না থাকলে থাকো না আমাদের সঙ্গে,' কিশোর বলল। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। গোয়েন্দাগিরিতেও সুবিধে হবে।'

'গোয়েন্দাগিরির কথা যখন তুললেই, আর আপত্তি করি কিভাবে? থেকেই যাই,' বলল এরিনা। 'আগেই বলেছিলাম উত্তেজনা ভালবাসি আমি। তা ছাড়া লেডি ওয়াগনারের সঙ্গে সাক্ষাতের লোভটাও সামলাতে পারছি না।'

'আমিও না,' কিশোর বলল।

কথাটা বলার পরই ওর হার্টবিট যেন বেড়ে গেল। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত। যাঁকে নিয়ে এত গল্প শুনেছে কিশোর, তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হতে যাচ্ছে ওর।

তেরো

মেইন রোডে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। লাঞ্চ করার জন্যে থামল একটা ছোট হোটেলে। গ্রাম্য, একটা মেঠো পথের ধারে হোটেলটা। ওরা এখন গ্রামে প্রবেশ করেছে। এদিকে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু হলো। এদিকের রাস্তাঘাট বেশ সরু। পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলা দায়। ঘাবড়ে গেল কিশোর।

'বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলে তো বিপদে পড়ে যাব আমরা,' শঙ্কিত গলায় বলল সে। অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাচ্ছে। একবার অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে ভয়ে ভয়ে আছে।

ওকে অভয় দিল এরিনা। রাস্তার পাশের মেঠো পথ দেখিয়ে বলল, 'স্কটল্যান্ডের সরু রাস্তার পাশে এ রকম মেঠো পথ অনেক আছে। বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলেও ক্ষতি নেই। চট করে মেঠো পথে উঠে যাওয়া যাবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মনোযোগ দিল প্রকৃতির প্রতি। গ্রাম এমনিতেই পছন্দ করে ও। আর স্কটল্যান্ডের গ্রামগুলোর নিসর্গের তুলনা নেই।

রাস্তার ধারে হলুদ রঙের অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ওদিকে এরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুসা। 'ভারী সুন্দর তো! কি ফুল ওগুলো?'

'ওগুলোর নাম গোর্স,' এরিনা জানাল। 'সারা বছরই এ ফুল ফোটে স্কটল্যান্ডে। প্রবাদ আছে গোর্স ফোটা বন্ধ হলে চুমুও অদৃশ্য হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।'

হাসল তিন গোয়েন্দা। কি অদ্ভুত বিশ্বাস। তবে বিশ্বাসটা খুব রোমান্টিক মনে হলো ওদের কাছে।

বিকেল চারটের দিকে এরিনা ঘোষণা করল তারা ওয়াগনার হাউসের একদম কাছে চলে এসেছে। একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল গাড়ি। তবে পাহাড়ের চূড়াটা সমতল। দূর প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি দেখতে পেল ওরা। বাড়িটাতে অনেকগুলো চিমনি। দূর থেকেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি আর ডুমুর, বীচ এবং সিলভার বার্চের সারি নিয়ে ফুটে উঠতে লাগল অপূর্ব প্রাকৃতিক ছবি।

প্রাসাদোপম বাড়িটা সুন্দর একটা বাগান দিয়ে ঘেরা। বাগানে নাম না জানা অনেক ফুল ফুটে আছে। বাড়ির একপাশে ছোট একটা পুকুর। পুকুরের চার ধারে ডগলাস আর ফার গাছ।

'ওহ্, অপূর্ব!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এখানে থাকতে পারলে আর কিছু চাইতাম না।'

এরিনা জানাল, বছরের এ সময়টাতে এদিকটা এ রকম সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে প্রকৃতি। তবে শীতকালে চেহারা ভিন্ন। তখন শুধু হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস

বইতে থাকে, আবহাওয়া থাকে বিষণ্ন, সেঁতসেঁতে।'

'কিন্তু তুমি তো এ পরিবেশেই অভ্যস্ত,' রবিন বলল।

'হাইল্যান্ডে থাকলে তুমিও এ রকম পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে,' জবাব দিল এরিনা। 'আর অভ্যস্ত না হতে পারলে শীতের সময় থাকতেই পারবে না। নিজেকে ভীষণ একা আর মনমরা লাগবে।'

ধূসর, পাথুরে দালানটার মেইন গেটে গাড়ি থামাল কিশোর। বাড়িটায় অসংখ্য ছোট ছোট কাঁচের জানালা।

গুনতে শুরু করল মুসা। ত্রিশ পর্যন্ত গুনেছে, এমন সময় খুলে গেল সদর দরজা। বেরিয়ে এল এক লোক। বাটলার।

খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাদের দেখে খুব খুশি হলাম।' কিশোরদেরকে সেন্টার হল-এর দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল সে, 'আপনাদের আসার খবর এখুনি জানিয়ে আসছি মিসেস ওয়াগনারকে।'

উঁচু ছাতওয়ালা লিভিংরুমে ওদেরকে বসতে দিয়ে চলে গেল বাটলার। চাচার কাছে ওয়াগনার হাউসের চাকচিক্যের কথা শুনেছে কিশোর, কিন্তু কল্পনাও করেনি এমন রাজকীয় হবে বাড়িটা। মেঝেতে বহুদামী কার্পেট পাতা। আসবাবগুলো ওক কাঠের। ছোট ছোট চেয়ার-টেবিলগুলো ফ্রেঞ্চ গিল্ট করা। দুটো প্রকাণ্ড জাপানি ল্যাম্প চোখে পড়ল কিশোরের। গায়ে ছবি আঁকা। অপূর্ব দেখতে। ঘরের পেছনে একটা বড় ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। ওতে এক তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। বাতাসে ফুলে উঠেছে তার আলখেল্লার মত পোশাক, মাথায় ঘোমটা। ছবিতে তরুণী প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে বর্শা হাতে যুদ্ধরত দুই নাইটকে।

'পুরানো দিনের সেই দৃশ্য,' বিড়বিড় করল রবিন। 'সুন্দর!'

কিছুক্ষণ পরে লিভিংরুমে ঢুকল বাটলার। জানাল লেডি ওয়াগনার ওদেরকে দোতলায় যেতে বলেছেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বাটলার। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। সিঁড়ির ল্যান্ডিংটাও ছোটখাট একটা ঘরের মত। এদিকের দেয়ালে অনেকগুলো তৈলচিত্র ঝোলানো, ওয়াগনারদের মৃত বংশধরদের ছবি। বাটলার ওদেরকে সুসজ্জিত একটা লিভিংরুমে নিয়ে এল, লেডি ওয়াগনারের ঘরের বাইরে ঘরটা। ভেতরে ঢুকল বাটলার। লেডি ওয়াগনারকে বলল তাঁর অতিথিরা চলে এসেছে।

'ধন্যবাদ, হেনরি,' মিষ্টি এবং জোরালো একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা দরজার বাইরে থেকে।

বাটলারের নাম তাহলে হেনরি। ভাবল কিশোর।

কিশোরই আগে ঢুকল ঘরে। তাকাল ঘরের বাসিন্দাটির দিকে।

ভদ্রমহিলার মাথার চুল যেন কাশ ফুল, ধবধব করছে। দুর্বল, রোগা শরীর। তবে চেহারাটা ভারী সুন্দর। আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে তাঁর গোটা অবয়ব থেকে।

নাটকীয় বিনীত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'লেডি ওয়াগনার, আমি আপনার এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। মৃদু হেসে বললেন, 'ওসব মধ্যযুগীয়

ফর্মালিটিজ রাখো তো। আমি তোমার চাচীর মামী। আমাকে নানী ডাকবে।'

তার বন্ধুদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। প্রত্যেকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন লেডি ওয়াগনার। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন, 'বোসো। চা খাও। আমি ক্যারিকে ডাকছি।'

দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা একটা রশি ধরে টান দিলেন তিনি। কোথাও টুংটাং শব্দে বেজে উঠল মিষ্টি ঘণ্টা। ডাকার জন্যে পুরানো দিনের কায়দাটাই বহাল রেখেছেন তিনি। আধুনিক কলিং বেল লাগাননি।

একটু পরেই মাঝবয়েসী এক মহিলা ঢুকল ঘরে। পরনে কালো গাউনের ওপর সাদা অ্যাপ্রন। মাথায় টুপি। এ ধরনের টুপি কখনও দেখেনি তিন গোয়েন্দা। অনেকটা ঘোমটার মত কুঁচি দেয়া টুপিতে, পেছন দিকে একজোড়া লম্বা, কালো পালক বেরিয়ে আছে।

একটা ট্রলি নিয়ে এসেছে মহিলা। তাতে চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের সাথে স্যান্ডউইচ, কেকসহ আরও অনেক কিছু আছে।

চা খেতে খেতে জমে উঠল গল্প। লেডি ওয়াগনার যে এতটা আন্তরিক হবেন, ভাবতেই পারেনি কিশোর। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে সে, কখন হারানো মূল্যবান জিনিসটার প্রসঙ্গ উঠবে। লেডি ওয়াগনার নিজেই প্রসঙ্গটা তুললেন। বললেন, 'মেরিকে যে জিনিসটা দেব ভেবেছিলাম ওটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা জিনিস। একটা ব্রোচ। ব্রোচের মাঝখানে ছিল বড় একটা পোখরাজ পাথর। চারপাশে হিরে দিয়ে সাজানো।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'তাই নাকি! নিশ্চয়ই অসাধারণ দেখতে জিনিসটা।'

মাথা ঝাঁকালেন লেডি ওয়াগনার। 'ব্রোচটা আমার এক পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন বোনি প্রিন্স চার্লি।'

'তাই!' অবাক হলো মুসা। 'সেই সুদর্শন রাজকুমার যিনি চাকরের ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন?'

হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'হ্যাঁ, তিনিই,' তাঁর চেহারায় করুণ একটা ভাব ফুটে উঠল। 'কিশোর, ওই পিনটা হারিয়ে নির্ঘুম রাত কাটছে আমার। আলমারি থেকে বের করেছিলাম দেখতে ওটা ঠিকঠাক অবস্থায় আছে কিনা। তোমার চাচীকে পাঠাব ভাবছিলাম। দেখার পর মনের অজান্তেই পরনের পোশাকে গেঁথে রাখি ওটা। অভ্যাস।

'ঘরে গরম লাগছিল বলে বাগানে হাঁটতে গিয়েছিলাম আমি। অনেকক্ষণ বাগানে হেঁটেছি। ঘুম আসছিল। আবার ঘরে ফিরে আসি আমি। পোশাকটা খুলে ওয়ার্ডরোবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। পরদিন সকালে ব্রোচটার কথা মনে পড়ে আমার। আলমারিতে ওটা তুলে রাখার জন্যে পোশাক তুলতে দেখি নেই ব্রোচটা।'

'ইস!' আফসোস করল এরিনা। 'নিশ্চয় খুব সুন্দর ছিল?'

ম্লান হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'তা তো নিশ্চয়ই। প্রথমে ভেবেছি হাঁটাহাঁটি

করার সময় ব্রৌচটা খুলে পড়ে গেছে। বাগানে তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কোথাও পেলাম না ওটা।'

'আপনি কি শিওর জিনিসটা সত্যি খোয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এ প্রশ্নে একটু যেন বিরক্ত হলেন ভদ্র মহিলা। 'তোমার কি ধারণা আমি মনের ভুলে ব্রৌচটা কোথাও খুলে রেখেছি?'

'না, না, আমি তা বলিনি!' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'জিনিসটা তো চুরি হয়েও যেতে পারে?'

বিস্মিত দেখাল লেডি ওয়াগনারকে। 'চুরি করবে কে? আমি ছাড়া এ বাড়িতে শুধু হেনরি আর ক্যারি থাকে। এরা দু'জনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত।'

'আমি ওদেরকে সন্দেহ করছিও না,' চট করে কিশোর বলল। 'আপনার ব্রৌচ হয়তো বাইরে কোথাও পড়ে গেছে। বহিরাগত কেউ ওটা পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করেছে।'

'তা হওয়া অসম্ভব নয়,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'তবে এখানে বহিরাগত আসে খুব কম। আমার একটা কুকুর ছিল। ওটার ভয়ে বাইরের কেউ ভেতরে ঢোকার সাহসই পেত না। দুঃখের বিষয়, যে রাতে ব্রৌচটা হারালাম আমি সে-রাতে কুকুরটাও গেল মরে।'

কিশোর পত্রিকার সেই লেখাটার কথা ভাবছিল। মূল্যবান জিনিসটা কেউ চুরি করেছে, এ সন্দেহ বরাবরই করে আসছে সে। যদিও পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ওটা হারিয়ে গেছে। কিশোরের মনোযোগ ভিন্ন দিকে ফেরানোর জন্যেই ওই তথ্য দেয়া হয়েছিল, সে-ব্যাপারে ওর সন্দেহ নেই।

চা পর্ব শেষ হবার পরে তরুণ অতিথিদেরকে ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। মুসা ও রবিন ওদের সুটকেস খুলতে ব্যস্ত, কিশোর আর এরিনা ঠিক করল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসবে। হারানো ব্রৌচটা খুঁজবে।

কিন্তু জিনিসটার কোন চিহ্ন ওরা দেখল না। তবে চোখে পড়ল জুতোর ছাপ। ওয়াগনার হাউসের পেছন দিকের মাঠে ফুটে আছে গভীর ছাপগুলো। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কিশোর ওগুলো হেনরির পায়ের ছাপ নয়। ছাপগুলো অনেক ভারী। আর হেনরি হালকা-পাতলা মানুষ। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে হেনরির কাছে গেল সে।

হেনরি আগাছা সাফ করছিল। পায়ের ছাপ দেখে জোর দিয়ে বলল এগুলো তার পায়ের ছাপ নয়। আর এদিকে কেউ আসেনি বলেই সে জানে।

'কেউ না কেউ তো এসেছেই,' কিশোর বলল। 'কারণ পায়ের ছাপগুলো তাজা। হয়তো কাল রাতেই কেউ চুরি করে ঢুকেছিল এখানে। হেনরি, এমনও তো হতে পারে এ পায়ের ছাপ সেই লোকের যে এখানে ঢুকেছিল লেডি ওয়াগনারের ব্রৌচ হারানোর রাতে, আর একই লোক আপনাদের পাহারাদার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে?'

শুনে হতবাক হেনরি। 'টোগোকে তো কেউ মারেনি। ওর গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। অবশ্য জানিও না কি কারণে মারা গেছে টোগো।'

ভেড়াচোরদের কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। ও সন্দেহ করেছিল চোরের দল অজ্ঞান করার ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করেছে ভেড়াগুলোকে। প্রহরী কুকুরটাকে কি একই কায়দায় কাবু করে ফেলেছিল চোর যাতে ডাকাডাকি করে কাউকে সাবধান করে দিতে না পারে ওটা?

আরেকটা সন্দেহ হলো কিশোরের। চোর যেহেতু দ্বিতীয়বার হানা দিয়েছে বাড়িতে, নিশ্চয়ই কোন কিছু চুরির মতলব ছিল তার।

হেনরির দিকে ফিরল কিশোর। 'হেনরি, এ পায়ের ছাপ কোন চোরের হওয়াই স্বাভাবিক। দেখুন তো, আপনাদের কোন জিনিস চুরি গেছে কিনা?'

চোদ্দ

কিশোরের কথা শুনে বুক চিতিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল হেনরি। 'মাস্টার কিশোর, ওয়াগনার হাউস থেকে কখনও কোন কিছু চুরি হতে পারে না। এ বাড়ির প্রতিটি দরজা-জানালায় বার্গলার অ্যালার্ম লাগানো আছে। কেউ ঢোকার চেষ্টা করা মাত্র বেজে উঠবে বেল। চোর ধরা পড়তে বাধ্য।'

'শুনে খুশি হলাম,' কিশোর বলল। 'আপনাদের বাড়িতে মূল্যবান জিনিসপত্রের তো অভাব নেই। জানেনই তো আর কিছুদিনের মধ্যে এ বাড়ি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিতি পেতে যাচ্ছে। তখন সারা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্টরা আসবে ওয়াগনার হাউস দেখতে।'

'স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট ফ্যামিলিও আসবেন,' গর্বিত গলায় জানাল হেনরি। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল নিজের কাজে।

কিছুক্ষণ পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর মুসা। বাগানে আর মাঠে ঘুরে বেড়াল ওরা। এ যাবৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করল। কিশোরের স্থির বিশ্বাস, ব্রোচটা চুরি গেছে।

'কিন্তু কে চুরি করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। অনুমানও করতে পারল না কিছু।

'একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না আমার, কিশোর,' বলল রবিন, 'চোর যদি ব্রোচ চুরি করে পালিয়েই যায় তাহলে সে বা তার দল কেন তোমাকে স্কটল্যান্ডে আসতে বাধা দিচ্ছিল?'

'ঠিক কথা। কেন?' রবিনের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল মুসা। 'লক লোমোন্ডের দুর্ঘটনায় আমি আর রবিন তো প্রায় মারাই যাচ্ছিলাম। এরিনাও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

কিশোর বলল তার ধারণা একটা দিকেই কেবল নির্দেশ করছে ব্যাপারটা। 'বড় ধরনের কিছু এর সঙ্গে জড়িত। ব্রোচ চুরিটা আসল ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস, যারা ভেড়া চুরি করছে, তারাই ব্রোচটাও চুরি করেছে। ওদের ভয়, ব্রোচ

খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে যদি ওদের খোঁজ পেয়ে যাই, তাহলে দলের সন্ধানও পেয়ে যাব। সেজন্যেই ঠেকাতে চেয়েছে আমাকে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল এরিনা। 'গোয়েন্দা হিসেবে কেন তুমি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান হয়ে গেছ এখন বুঝতে পারছি।'

কিশোরকে বলল মুসা, 'তোমার সন্দেহ সত্যি হলে ধরে নিতে হয় রকি বীচের কিম ব্রাগনার, রহস্যময় মিস্টার পেইশা এবং লাল-দাড়ি এরা সবাই ভেড়া চোরের দলের সদস্য।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

রবিন বলল, 'কিশোর, তুমি তো হাউসবোটের ওই লোকগুলোকেও সন্দেহ করেছিলে। চুরি যাওয়া ব্রোচটা ওখানে থাকতে পারে না?'

'তা পারে,' জবাবটা দিল মুসা। 'কিন্তু এক পাল ভেড়াকে হাউসবোটে লুকানো সম্ভব না। যায় কোথায় ওগুলো?'

কিশোর বলল, 'জ্যান্ত রাখতে না পারলেও চুরি করা পশুর পশম, চামড়া এ সব লুকানো অসম্ভব নয়। হয়তো দূরে কোথাও পাচার করে দেয়। আমেরিকায় হলেও অবাক হব না।'

'হুঁ, তা ঠিক,' মাথা দোলাল এরিনা। 'প্রশাসন হারিয়ে যাওয়া জ্যান্ত ভেড়া খুঁজছে, পশম বা চামড়া খোঁজার চিন্তাই হয়তো তাদের মাথায় নেই।'

এরপর মিনিটখানেক চুপচাপ হাঁটল ওরা। তারপর কিশোর বলল, 'কাল একবার আমি ওই রাস্তায় যাব যেখান থেকে ভেড়ার ডাক শুনেছিলাম।'

'মিসেস কারগুনারের বাড়ির কাছে যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ওখানে গেলে কোন সূত্র পেতে পারি।' এরিনার দিকে ফিরল। 'ওই ট্রাকটা কোত্থেকে আসে অনুমান করতে পারো?'

এরিনার সন্দেহ, বেন নেভিস পাহাড়ের নিচের উপত্যকা থেকে আসে। কি ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা রাতের বেলা ক্যাম্পিং-এ বেরোই না কেন? উপত্যকাটা ভারী সুন্দর। ওখানে অনেক লোকজন আসে পাহাড়ে চড়তে। বেন নেভিসে ওঠার দৌড় প্রতিযোগিতাও করে কেউ কেউ।'

রবিন জানতে চাইল, 'পাহাড়টা কত উঁচু?'

'সাড়ে চার হাজার ফুটের কাছাকাছি।'

অবাক দেখাল মুসাকে। 'অতখানি ওপরে দৌড়ে ওঠে?'

'হ্যাঁ।'

মুচকি হাসল রবিন। 'রহস্য থাক বা না থাক পাহাড়টা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।'

ক্যাম্প করার পরিকল্পনায় রোমাঞ্চিত হলো তিন গোয়েন্দা। বাড়ি ফিরে লেডি ওয়াগনারের কাছে জানতে চাইল কিশোর, ক্যাম্প করার সরঞ্জামাদি পাওয়া যাবে কিনা ওবাড়িতে।

'চিলেকোঠাতেই পাবে,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'ক্যাম্প আর হাইকিঙের

জন্যে বহু জিনিস আছে ওখানে।'

চিলেকোঠায় যাবার আগে লেডি ওয়াগনার তিন গোয়েন্দা আর এরিনাকে নিজের প্রকাণ্ড বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। এক সঙ্গে এত তৈলচিত্রের সমাহার জীবনেও দেখেনি মুসা। একটা ঘরে নাইটদের অনেক বর্ম ঝুলতে দেখা গেল।

চিলেকোঠা বলতে অপ্রশস্ত গুমোট একটা ঘর দেখবে ভেবেছিল কিশোর। কিন্তু লেডি ওয়াগনারের চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল ও। বিশাল একটা ঘর। চমৎকার সব আসবাব দিয়ে সাজানো। লেডি ওয়াগনার জানালেন এক সময় এটা গেম রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ওয়াগনার হাউসের পুরুষরা অতিথিদের নিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতেন। ঘর ভর্তি পুরানো দিনের আসবাবপত্র, বই আর ট্রাঙ্ক।

'ট্রাঙ্কে নানা ধরনের কাপড় চোপড় আর কম্বল পাবে,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'যার যা পছন্দ নিয়ে নাও।'

ট্রাঙ্কের ভেতরের জিনিসপত্র দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কত রকমের যে ঘাগরা চোলি, ব্লাউজ আর মোজা তার হিসেব নেই। টুপিও আছে প্রচুর।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল কিশোরের। 'এ দিয়ে চমৎকার ছদ্মবেশ হবে।'

ভুরু কোঁচকালেন লেডি ওয়াগনার। 'ছদ্মবেশ দিয়ে কি হবে?'

'এই একটু মজা করা আরকি,' এখনই তার সন্দেহের কথা মহিলাকে বলতে চাইল না কিশোর। যদি বিপদের কথা ভেবে ঘাবড়ে যান। বাধা দিয়ে বসেন।

হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'করও মজা। এ সব পোশাক এক সময় আমার পূর্বপুরুষরা পরতেন। জানো বোধহয় আমার পূর্বপুরুষদের অনেকেই বিভিন্ন উপজাতির বংশধর ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, চাচীর কাছে শুনেছি।'

ট্রাঙ্ক থেকে যে যার পছন্দ মত পোশাক বেছে নিল তিন গোয়েন্দা। চমৎকার মানিয়ে গেল সবাইকে।

'এ সব পরে বাইরে গেলে কোন অসুবিধে নেই তো?' জানতে চাইল কিশোর। 'ছিঁড়েটিড়ে যায় যদি।'

লেডি ওয়াগনার আশ্বস্ত করলেন অসুবিধে নেই।

'তোমাদেরকে স্লিপিং ব্যাগ বা বেড রোল দিতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'ট্রাঙ্কে ন্যাকস্যাক আর গরম কম্বল আছে। ওতেই ক্যাম্পিঙের কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

ট্রাঙ্ক খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। ক্যারি ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। 'তোমাদেরকে একদম হাইল্যান্ডারদের মত লাগছে!'

হাসল তিন গোয়েন্দা। বলল ক্যাম্পিঙে যাচ্ছে। গাড়িতে চড়ে বসল সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে। খাবারের প্যাকেট আর ঝুড়িটা গাড়িতে তুলে দিল ক্যারি।

এরিনার নির্দেশ মত শর্টকাটে গাড়ি চালাল কিশোর। রাস্তাটা মিসেস

কারগুনারের বাড়ির পাশ দিয়ে বেন নেভিস পাহাড়ের দিকে মোড় নিয়েছে।

যেখানে সূত্র পাবে আশা করেছিল কিশোর, সেখানে পৌঁছে তেমন কিছু চোখে পড়ল না ওদের। উপত্যকার দিকে চলল তখন ওরা।

উপত্যকায় পৌঁছে একটা ব্রিজের ওপর উঠল। ব্রিজের নিচে একটা সরু নদী। পাহাড়ী জলপ্রপাত থেকে ওটার সৃষ্টি। ব্রিজের নিচ দিয়ে স্বচ্ছ পানি কলকল করে বয়ে চলেছে।

'দারুণ! দারুণ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে মুসা।

দু'পাশে খাড়া পাহাড়। তবে এত খাড়া নয় যে পাহাড়ে চড়া যাবে না। গাছ আর ঝোপঝাড়ের মাঝে ইতস্তত ছড়ানো পাথর খণ্ড। এখানে ওখানে জন্মে রয়েছে এক ধরনের বুনো গুল্ম, বেগুনি ফুল। পাহাড়ের বুকে অপূর্ব লাগছে।

রাস্তাটা চলে গেছে নদীর পাশ ঘেঁষে। বেশ কয়েক জায়গায় সাইন বোর্ড চোখে পড়ল ওদের। এরিনা জানাল ওগুলো ক্যাম্পারদের জন্যে সংরক্ষিত। রাস্তায় একদল হাইকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। বেন নেভিসে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্যে প্রস্তুত।

রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। জানালা দিয়ে গলা বাড়াল সবাই। হাইকারদের দেখছে। চারটে ছেলে। সবার পরনে সাদা ট্রাঙ্ক আর জার্সি। তাতে স্কুলের তকমা লাগানো। একটা ছেলে এরিনাকে দেখে হাত তুলল।

'আমার জন্যে দোয়া কোরো,' জোরে জোরে বলল সে। 'আমরা ওই বড় পাইন গাছটা পর্যন্ত দৌড়ে যাব। আবার ফিরে আসব। যাব-আসব বিশ মিনিটের মধ্যে।'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল এরিনা। তিন গোয়েন্দাকে বলল ছেলেটা ওর দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই। নাম ডেনিস। ছেলেগুলো দৌড় শুরু করল। ওদের দৌড়ের ভঙ্গি দেখে কিশোররা অবাক। কি স্বচ্ছন্দে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। পাইন গাছটার কাছে দলটাকে পৌঁছুতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল এরিনা, 'দেখো দেখো, ডেনিস সবার আগে!'

ঢাল বেয়ে ডেনিসই সবার আগে নামতে শুরু করল। তবে ওঠার চেয়ে নামাটা বেশি বিপজ্জনক মনে হলো। গোয়েন্দারা সবাই যে যার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। এরিনা বলল, 'ডেনিসই জিতবে।'

হলোও তাই। ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় যেখান থেকে দৌড় শুরু করেছিল সেখানে পৌঁছে গেল ডেনিস। ওর বন্ধুরা এলো যথাক্রমে পঁচিশ মিনিট, আটাশ মিনিট এবং ত্রিশ মিনিটে।

এরিনা ওর চাচাত ভাই এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তিন গোয়েন্দার। কিশোরদের ওরা ওদের ক্যাম্পে যাওয়ার দাওয়াত দিল। নদীর তীরে ক্যাম্প করেছে ডেনিসরা।

সানন্দে দাওয়াত কবুল করল এরিনা এবং তিন গোয়েন্দা। ডেনিসদের সঙ্গে চলে এল নদীর তীরে। ওখানে আরও অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আছে। বেশির ভাগের পরনে ঘাগরা। ক্যাম্পারদের কেউ এসেছে আইল অভ স্কাই থেকে, কেউ বা

ইনভারনেসের শহর থেকে। দেখা গেল অনেককেই এরিনা চেনে। সবাই বেশ আন্তরিক। ফলে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে সময় লাগল না তিন গোয়েন্দার।

অনেক গল্পগুজব হলো। খাওয়া দাওয়া হলো। সবাই হাসি-ঠাট্টায় মশগুল, এমন সময় দূরবর্তী বাঁশির আওয়াজে কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। কাত হয়ে শুয়েছিল, উঠে বসল। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে কে যেন। একটা সুরই বাজাচ্ছে বারবার। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে। সেই স্কটস হোয়া হেই।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে পাহাড়ের দিকে তাকাল কিশোর। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কোনও ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে? একের পর এক অতীতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগল কিশোরের। কয়েকটা প্রশ্ন এল মাথায়। ওই বিশেষ সুরটা কি বারবার ওকে উদ্দেশ্য করেই বাজানো হচ্ছে? বাঁশিটা কি মিস্টার পেইশা বাজাচ্ছে? সে কি তার সঙ্গীদের বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে কাছাকাছিই আছে কিশোর?

সে বাদে মুসা বা রবিন কেউই খেয়াল করেনি বাঁশির শব্দ। এরিনাও না। যেমন বেজে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল বাজনা। বাঁশি বাজার কথা সহকারীদের জানাল কিশোর। বলল, 'আমি পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি। রহস্যময় বাঁশিওয়ালার খোঁজ মেলে কিনা দেখি।'

মুসা বলল, 'ওটা তোমার জন্যে কোন ফাঁদ নয় তো? বিপদে পড়ে যাও যদি?'

হাসল কিশোর। 'সবাই এক সঙ্গে গেলে কোন বিপদ হবে না।'

রবিন বলল, 'তোমাকে একা ছাড়বও না আমরা।'

ক্যাম্পারদের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। বলল পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছে। তবে গরম আবহাওয়ার জন্যে পাহাড়ে চড়াটা তেমন সুখকর হলো না। ঘেমে নেয়ে গেল সবাই। কিশোর আর এরিনা এগিয়ে আছে সামনে। মুসা আর রবিন খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে মুসা ওদের নাগাল ধরে ফেলল একটু পরেই।

'রবিন কই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মুসা বলল তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্যে অন্য রাস্তা ধরে আসছে রবিন। 'ওর আর তর সইছে না। তাড়াতাড়ি চূড়ায় উঠতে চায়।'

ঠিক তখন রবিনের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। পাঁই করে এক সাথে ঘুরে দাঁড়াল তিনজন। সামনের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল ভয়ে। ওদের থেকে খানিক দূরে, পাহাড়ের উতরাইয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে রবিনকে। এ লোকটাই ফেরিতে ধাক্কা মেরে ওদের ফেলে দিয়েছিল।

'আবার সেই লাল-দাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ল রবিন। পর মুহূর্তে ডিগবাজি খেতে খেতে পাহাড় থেকে পড়ে যেতে শুরু করল ও। আর লাল-দাড়ি এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল ঢালের আড়ালে।

পনেরো

কিশোর আর মুসা ছুটল রবিনকে বাঁচাতে। গড়াতে গড়াতে ও পড়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে।

রবিনের ভাগ্য ভাল সামান্য নিচেই খাড়া ঢাল সমতল হয়ে গেছে। থেমে গেল তার গড়ানো। কিশোর আর মুসা ততক্ষণে চলে এসেছে কাছে। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল কিশোর, 'লাগেনি তো?'

রবিন জবাব দেয়ার আগে বলে উঠল মুসা, 'লাগেনি মানে! দেখছ না ওর গা কত জায়গায় ছড়ে গেছে। রবিন, চলো। এখনই ডাক্তারের কাছে যাব।'

'তার দরকার হবে না,' বলল রবিন। 'তেমন লাগেনি আমার।'

উঠে দাঁড়াল ও। দুই বন্ধু সহায়তা করল ওকে। গা থেকে যতটা সম্ভব ধুলো ঝেড়ে ফেলল।

'লাল-দাড়ি ব্যাটাকে ধরতেই হবে,' ক্ষোভের সঙ্গে রবিন বলল। 'আমাকে এ ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল!'

এ সময় খেয়াল করল ওরা এরিনা নেই ওদের সঙ্গে। এদিক-ওদিক তাকাল তিন গোয়েন্দা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না এরিনাকে।

ভয় পেয়ে গেল ওরা। লাল-দাড়িটা এরিনার কোন ক্ষতি করেনি তো?

'আমি ওপরে যাচ্ছি। এরিনাকে খুঁজে বের করব,' কিশোর বলল।

মুসা আর রবিন বলল ওরাও যাবে। তিনজনে মিলে পাহাড় বাইতে শুরু করল। একটু পর পর নাম ধরে ডাকল এরিনার। সাড়া মিলল না।

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠে এসেছে কিশোর, জঙ্গলের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল এরিনাকে। জঙ্গলের ধারের ঢালের কাছে আছে ও। দূর থেকে দেখে মনে হলো নিজেকে আড়াল করে কোন কিছুর ওপর চোখ রেখেছে।

বন্ধুদের নিয়ে এরিনার কাছে চলল কিশোর। ঢালের ধারে এসে ডাক দিল এরিনাকে। জানতে চাইল ও এখানে কি করছে। হাসল এরিনা। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বলতে পারো তোমাদের মত গোয়েন্দা হবার চেষ্টা করছি। আমি লাল-দাড়িকে এদিকে দৌড়ে আসতে দেখেছি। ভাবলাম এদিকে এলে লোকটার দেখা পাব।'

'খোঁজ পেয়েছ লোকটার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল এরিনা। 'লাল-দাড়ির খোঁজ পাইনি। তবে একটা জিনিসের খোঁজ পেয়েছি। ওই দিকে দেখো।'

নিচে হাত তুলে দেখাল ও।

ওদের নিচে সরু একটা উপত্যকা, সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছে একপাল ভেড়া। এরিনা জানাল খানিক আগেও ওখানে এক মেষপালক ছিল। এখন নেই।

'মেষপালকদের সঙ্গে কুকুর থাকবেই,' বলল এরিনা। 'কিন্তু এ লোকের সঙ্গে ছিল না। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। আমার ধারণা লোকটা মেষপালক নয়, ছদ্মবেশী কেউ। ভেড়াগুলো নির্ঘাত চুরি করা। এখানে এনেছে পাচার করার জন্যে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তোমার সন্দেহ অমূলক না-ও হতে পারে। এখুনি পুলিশে খবর দেয়া দরকার।'

'এখান থেকে খবর দেয়া যাবে না। ফোন নেই। তার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমার সন্দেহ ওই লাল-দাড়ি আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছে,' কিশোর বলল। 'সে-ই হয়তো বাঁশিতে স্কটস হোয়া হেইর সুর বাজিয়ে তার স্যাঙ্গাৎদের সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আমরা এখানে ক্যাম্পিঙে এসেছি। আমরা পাহাড়ে উঠে এলে মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কারণ তার এলাকার কাছে চলে এসেছি আমরা।'

'আর মরিয়া হয়ে সে ধাক্কা মেরে আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়,' বলল রবিন। 'ভেবেছে তোমরা আমাকে বাঁচানোর জন্যে ছুটে আসবে। ব্যস্ত থাকবে আমাকে নিয়ে। ভেড়া বা অন্য কিছুর চিন্তা করবে না।'

'ঠিক বলেছ।'

'কিন্তু তারপর আর কিছু করার সাহস পায়নি। ভেড়া না নিয়েই ভেগেছে।'

ওরা ঢাল ছেড়ে চূড়ার দিকে এগোল। তারপর চলে এল নদীর ধারে। ঠাণ্ডা পানিতে ভাল করে হাত মুখ ধুলো রবিন। ঝরঝরে লাগল শরীর।

সে-রাতে স্কটিশ ক্যাম্পারদের সঙ্গে বেশ জমে উঠল তিন গোয়েন্দার। ক্যাম্পাররা পুরানো এবং নতুন স্কটিশ গান গেয়ে শোনাল। দু'একটা জানা গানে সুর মেলানোর চেষ্টা করল তিন গোয়েন্দা। গান শেষে প্রথমে মেয়েরা তারপর ছেলেরা নাচল ব্যাগপাইপের সুরে। একটা ছেলে নিয়ে এসেছে বাদ্যযন্ত্রটা।

কিশোরদেরকেও নাচতে হলো ওদের সঙ্গে। প্রথমে একটু অসুবিধে হলো স্কটিশদের সঙ্গে পা মেলাতে। কিন্তু মুসা জমিয়ে ফেলল। পরে আর তেমন অসুবিধে হলো না। সবাই হাততালি দিতে লাগল তাকে।

নাচের পরে সবশেষে গান গাইতে হলো এরিনাকে। মিষ্টি গলা ওর। দরদ দিয়ে গাইল হাইল্যান্ডারদের একটা প্রিয় গান। তিন গোয়েন্দা ওর গান শুনে মুগ্ধ।

'এ তো ভাল গাইতে পারো তুমি কল্পনাই করিনি,' প্রশংসা না করে পারল না রবিন।

গভীর রাতে আরেক বার খাওয়া-দাওয়া চলল। তারপর সবাই ঘুমাতে গেল। কেউ ঢুকল তাঁবুতে, কেউ বেডরোল নিয়ে শুয়ে পড়ল, কেউ বা ভারী কম্বলে শরীর মুড়ে নিল।

কিন্তু ঘুম আসছিল না কিশোরের। কান পেতে নদীর কলকল শব্দ শুনতে লাগল ও। মনে হলো নদী যেন ওর সঙ্গে কথা বলছে।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ কিশোরকে অবাক করে দিয়ে ভেসে এল শিসের

আওয়াজ। শব্দ শুনেই বুঝতে পারল ব্যাগপাইপের সাহায্যে কেউ শিস দিচ্ছে। সঙ্কেত দিচ্ছে বাদক। কিসের সঙ্কেত? কাকে দিচ্ছে?

কম্বলের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। চোখ বোলাল পাহাড়ে। ঝলমলে চাঁদের আলোয় বেন নেভিস ধবধব করছে।

চূড়া থেকে নিচে, একটা ঢালের মাথায় আবছা কুয়াশার মধ্যে বংশীবাদকের অবয়ব অস্পষ্টভাবে ফুটে থাকতে দেখল কিশোর। বন্ধ হয়ে গেল শিস। সেই সঙ্গে অদৃশ্য বংশীবাদকও।

বাঁশিওয়ালা কি রক্তমাংসের মানুষ? নাকি ভূত? কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে না কিশোর। তারমানে মানুষ।

কিশোরের মনে পড়ে গেল এর আগে সে যখন বাঁশির আওয়াজ শুনেছিল ওই সময় তার সামনে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল চোরাই ভেড়া নিয়ে একটা ট্রাক। এইমাত্র যে শিস দেয়া হলো ওটা কি কোন সঙ্কেত ছিল? সঙ্কেত দিয়ে বোঝানো হলো এখন কোন সমস্যা নেই, কিশোররা উপত্যকায় যে ভেড়ার পাল দেখেছে ওগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে?

এতক্ষণে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছেও। গিয়ে আর লাভ হবে না।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল ও, বলতে পারবে না।

পরদিন সকালে তারই ঘুম ভাঙল সবার আগে। তারপরে জাগল এরিনা।

রাতের ঘটনা এরিনাকে খুলে বলল কিশোর। 'বেন নেভিসের সেই ঢালটার কাছে যাবে আমার সঙ্গে?'

'চলো।'

পাহাড়ে উঠে এল ওরা। আগের ঢালটার ধারে এসে নিচে তাকাল। উপত্যকার দিকে। যা ভেবেছিল কিশোর। একটা ভেড়াও নেই ওখানে।

'তোমার সন্দেহই মনে হচ্ছে ঠিক,' এরিনা বলল।

'চলো তো খুঁজে দেখি, চোরগুলোকে ধরার জন্যে কোন সূত্রটুত্র পাই কিনা,' কিশোর বলল।

হাঁটতে হাঁটতে এরিনা বলল, 'মেষপালকরা তাদের ভেড়া পাহাড়ের ধারে মুক্তভাবে চড়ে বেড়ানোর সুযোগ দেয়। কাজেই তোমার হারানো ভেড়ার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো।'

উপত্যকায় এসে কোন প্রাণী বা মানুষের চিহ্নও দেখল না কোথাও। একটা ছোট গোলাবাড়ি চোখে পড়ল ওদের। কোন মেষপালকের হবে।

'দেখি তো লোকটা বাড়ি আছে কিনা,' কিশোর বলল।

দরজায় কড়া নাড়ল দু'জনে। সাড়া পেল না কারও। এরিনা বলল এ বাড়িতে বোধহয় কেউ থাকে না। দরজায় ধাক্কা দিল ওরা। তালা মারা নেই। ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকল ওরা। ঘরে একটা খাটিয়া, একটা টেবিল আর একটা আলমারিতে কিছু খাবার দেখতে পেল। ফায়ারপ্লেসে ছাই জমে আছে।

'কেউ এখানে থাকে বোঝাই যাচ্ছে,' কিশোর বলল।

না বলে ঘরে ঢুকে পড়ায় অস্বস্তি লাগছিল দু'জনেরই। চলে যাবার জন্যে পা

বাড়িয়েছে, কিশোরের চোখ আটকে গেল টেবিলের ওপর রাখা একটা খোলা বইতে। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বইটার দিকে চোখ। গেইলিক ডিকশনারি। খোলা পাতায় একটা শব্দের নিচে দাগ দেয়া। শব্দটা হলো mall।

'এরিনা, এ শব্দটা আমি মিস্টার পেইশার হোটেল রুমের সেই মেসেজের মধ্যে দেখেছি।'

দ্রুত অভিধানের পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। দেখতে চায় মেসেজের আরও কোন শব্দ দাগ দেয়া আছে কিনা।

'এই যে একটা শব্দ আছে rathad,' উত্তেজিত হয়ে বলল ও।

'এটার নিচেও দাগ দেয়া।'

এরপর আরও কয়েকটা শব্দ খুঁজে পেল কিশোর: dig, glas, slat, long, bean, ball, gun, ail। সবগুলোর নিচেই দাগ দেয়া।

ষোলো

এগুলো জরুরী সূত্র, বুঝতে পারল কিশোর।

এরিনা জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশকে জানাবে না?'

'অবশ্যই জানাব। মিসেস কারগুনারের ওখানে কি ঘটেছে তা-ও বলব,' জবাব দিল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কি যেন ভাবছে। বলল, 'এরিনা, মেসেজে লেখা highway ditch কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করছি। ভাবছি ওই কথা দিয়ে বিশেষ কোন রাস্তাকে বোঝানো হচ্ছে কিনা যেখান দিয়ে চোরগুলো যাতায়াত করে।'

বিস্মিত দেখাল এরিনাকে। 'তুমি না আগে ওই কথার অন্য মানে করেছিলে? বলেছিলে ওই কথার অর্থ হলো মিস্টার পেইশা কিংবা তার বন্ধুরা তোমাকে খাদে ফেলে দিতে চেয়েছিল।'

'ও সবই অনুমান। এখন যা বলছি সেটাও অনুমান। lock rod আর wife member without stamp কথা দুটোর অর্থ যদি বের করতে পারতাম!'

ডিকশনারিটা খোলা পেয়েছে। সেভাবেই রেখে যাবে ঠিক করল কিশোর। তাহলে কেবিনের বাসিন্দা বুঝতে পারবে না কেউ ওটা ধরেছে। কিশোর হাতে তুলে নিল বইটা। পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ চমকে গেল সে।

ডিকশনারির পাতার ফাঁকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সেই অটোগ্রাফ দেয়া কাগজটা।

'কি হলো?' জানতে চাইল এরিনা।

জানাল কিশোর।

উদ্বিগ্ন দেখাল এরিনাকে। 'রকি বীচের সেই অটোগ্রাফ সংগ্রহকারী তাহলে এখানেই থাকে। এটাকে গোপন আস্তানা বানিয়েছে।'

বিভ্রান্ত লাগছে কিশোরের। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলতে শুরু করেছে এ সময় আরেক নতুন রহস্য। এবার ওকে নিয়েই টানাটানি।

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি কিম ব্রাগনার আমার অটোগ্রাফ নিয়েছিল ওদের বদ মতলব হাসিল করার জন্যে।'

আবার 'wife' বা 'স্ত্রী' শব্দটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কোন মহিলা কি কোনও কারণে কিশোরের সই ব্যবহার করে চলেছে?

কি করবে ভাবছে কিশোর। অটোগ্রাফের কাগজটা নিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু এটা এখানে না দেখলে সাবধান হয়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষ। তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়ে কেটে পড়তে পারে। কিশোর ঠিক করল কাগজটা নেবে না। রেখে যাবে। ওদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

কাগজটা যেখানে ছিল সেখানেই আবার রেখে দিল কিশোর। বেরোনোর আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল দু'জনে। আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কারও চোখে পড়ার আগেই দ্রুত ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা। তারপর পা বাড়াল নদীর দিকে। অন্যান্য ক্যাম্পাররা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। নাস্তার আয়োজন করছে।

ওদেরকে দেখে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা আর রবিন। 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? আমরা এদিকে তোমাদের খুঁজে মরি।'

'কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত,' কিশোর বলল। তারপর দুই সহকারীকে জানাল সকালের অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

নাস্তা সেরে ওয়াগনার হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা। লেডি ওয়াগনারকে দেখল বাগানে হাঁটাহাঁটি করছেন। ওদেরকে এত সকাল সকাল ফিরতে দেখে অবাক হলেন তিনি। বললেন, 'নিশ্চয়ই বলবে না যে এরই মধ্যে রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ।'

'না,' জবাব দিল কিশোর, 'তা বলব না। তবে আমরা দারুণ একটা আবিষ্কার করে এসেছি। এখুনি পুলিশকে জানানো দরকার।'

লেডি ওয়াগনারের চেহারায় অন্ধকার ঘনাল। 'পুলিশও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোমার জন্যে দুঃসংবাদ আছে, কিশোর।'

বৃদ্ধা জানালেন তাকে স্থানীয় সুপারিনটেনডেন্ট ফোন করেছিলেন।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় শুনে খটকা লাগল। তোমাকে একটা ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

'আমাকে সন্দেহ!' আকাশ থেকে পড়ল কিশোর। 'কি নিয়ে সন্দেহ?'

লেডি ওয়াগনার জানালেন কিছুদিন আগে কয়েকটা জাল চেক দিয়ে স্কটল্যান্ডের ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছে। চেকে দস্তখত ছিল ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনালে ছাপা হওয়া ছেলেটার অর্থাৎ কিশোরের।

থমথমে হয়ে গেল কিশোরের চেহারা। 'আমার অটোগ্রাফ তাহলে অসৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। জাল করেছে কেউ আমার দস্তখত।'

লেডি ওয়াগনারকে রকি বীচের ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। বলল কিভাবে এক লোক তার সই জোগাড় করেছিল। ওই কাগজটাই সে কিছুক্ষণ আগে উপত্যকার গোলাবাড়িতে দেখে এসেছে।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন লেডি ওয়াগনার। 'আমি অবশ্য সুপারিনটেনডেন্টকে বলেছি তুমি এ কাজ করতেই পারো না। কিন্তু গোঁ ধরে রইল সে। শেষে বলতে বাধ্য হলাম তুমি আসা মাত্র থানায় ফোন করতে বলব তোমাকে।'

'এখুনি যাচ্ছি,' বলে ঘরের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

থানায় ফোন করল সে। ফোন ধরলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজেই। বললেন দু'জন ইন্সপেক্টরকে লেডি ওয়াগনারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই ইন্সপেক্টর এসে হাজির। একজন তরুণ, হাসিখুশি স্বভাবের। নাম ক্রুগার। অপরজন গোমড়ামুখো। পিটার।

লেডি ওয়াগনারের বিশাল ড্রইংরুমে বসে কথা বলল ওরা। ক্রুগারের আচরণ দেখে মনে হলো কিশোরের কথা বিশ্বাস করেছে সে। কিন্তু পিটারের মনোভাব তার উল্টো। তার ধারণা মিথ্যা বলছে কিশোর।

'এ দেশে আমার কোন অ্যাকাউন্টই নেই,' কিশোর বলল। 'আমি চেক লিখতে যাব কেন? যে আমার নামে এই অপকর্ম করেছে সম্ভবত আমার ছদ্মবেশ নিয়েছিল সে।'

'আমরা যে তরুণীর চেহারার বর্ণনা পেয়েছি,' কর্কশ গলায় বলল পিটার , 'তার সঙ্গে তোমার চেহারা মিলে যায়। তুমি মেয়ের ছদ্মবেশ নিলে অবিকল তার মতই লাগবে। পত্রিকার ছবি দেখে অনেকে নিশ্চিত করেছে প্রচ্ছদের কিশোর ছেলেটাই আসল অপরাধী, পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মেয়ের ছদ্মবেশ নিয়েছিল।'

জবাবে কি বলবে ভেবে পেল না কিশোর। ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পিটার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল কিশোর বা তার বন্ধুদের থানার অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া নিষেধ।

লেডি ওয়াগনার এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। এই প্রথম কথা বললেন তিনি। 'আমি যদি কিশোর আর তার বন্ধুদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিই তাহলে ওদের বাইরে যাবার ব্যাপারে কোন আপত্তি করবে তোমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট?'

কিশোর বুঝতে পারছে জটিল আর ঘোরাল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। লেডি ওয়াগনারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না পিটার। ওদিকে নিজের ডিউটিও পালন করতে হবে। একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। ওর চাচাকে ফোন করলে কেমন হয়। তিনি হয়তো কোন সমাধান দিতে পারবেন।

ইন্সপেক্টরদের বলল সে, ওর চাচাকে ফোন করতে চায়। রাজি হলো ওরা। কিশোরের ভাগ্য ভাল রাশেদ পাশাকে পেয়ে গেল তাঁর এডিনবার্গের হোটেলে

রুমে। দ্রুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ও। সব শুনে খুব রাগ হলো রাশেদ পাশার। তিনি ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

ফোন ধরল পিটার। কয়েক মিনিট হুঁ-হ্যাঁ করার পর রিসিভার রেখে দিল। তারপর ফোন করল তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। কিশোররা চুপচাপ বসে রইল ড্রইংরুমে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা শেষ করে পিটার বলল, 'মিস্টার রাশেদ পাশাও প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর ভাতিজার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন তিনি। অতএব তোমাদের বাইরে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে বিধিনিষেধ শিথিল করা হলো।'

'ধন্যবাদ,' তিক্তকণ্ঠে কিশোর বলল। 'আমি এখন খুঁজে বের করব কে চেক জাল করে আমাকে ফাঁসিয়েছে।'

মিসেস কারগুনারের বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার খবর ইন্সপেক্টরদেরকে জানাল সে। বলল ওর সন্দেহ ভেড়াচোরেরা উপত্যকাটিকে গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে। 'গতকাল আমি একপাল ভেড়া দেখেছি ওখানে। কিন্তু আজ সকালে দেখি একটাও নেই। ওখানে একটা গোলাবাড়িতে গেলে এক টুকরো কাগজে আমার নাম সই দেখতে পাবেন। আমেরিকায় একটা লোক চালাকি করে আমার অটোগ্রাফ নিয়ে নিয়েছিল। সেই অটোগ্রাফটাই ওটা।'

পুলিশ অফিসাররা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। পিটারের চোখে আক্রমণাত্মক ভাবটা নেই, বরং প্রশংসা দেখা যাচ্ছে।

কিশোর বলল, 'অটোগ্রাফটা পাবেন একটা গেইলিক ইংলিশ ডিকশনারির মধ্যে।'

চলে গেল ইন্সপেক্টর দু'জন। দেরি না করে উপত্যকায় তদন্ত চালাবে।

লাঞ্চের পরে কোন খবর আছে কিনা জানার জন্যে থানায় ফোন করল কিশোর।

'গোলা বাড়িতে গিয়ে খান কয়েক আসবাব ছাড়া আর কিছুই পাইনি,' ক্রুগার জানাল ওকে। 'বাকি সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

শুনে দমে গেল কিশোর। আবার তীরে এসে তরী ডোবার মত অবস্থা।

'ভেড়ার কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর। 'কেউ তার ভেড়া চুরির খবর জানিয়েছে?'

'এক কৃষক বলল তার পঞ্চাশটা ভেড়া খুঁজে পাচ্ছে না। ফেয়ারি ব্রিজের বামনদের মত যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে ভেড়াগুলো।'

ফোন শেষ করে বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর। এরিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি সব ফেয়ারি ব্রিজের বামনদের কথা বলছিল অফিসার। ঘটনাটা কি বলো তো?'

মুচকি হাসল এরিনা। বলল, 'ও রূপকথাই বলতে পারো। বহু বহু বছর আগে নাকি এক ধরনের বামন মানুষ বাস করত আমাদের দেশের কাছে। দুষ্টুমি করতে ভালবাসত তারা। একদিন তাদের দেশে বিশালদেহী কিছু মানুষ এল। বামনরা

ভাবল এদের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। তাই তারা বিশালদেহীদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে শুরু করল। একদিন কয়েকজন বামন সাহস করে বিশালদেহীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে বসল। পরক্ষণে ভয় পেয়ে গিয়ে লুকাল অনেক দিনের পুরানো পাথুরে একটা ব্রিজের নিচে। এ ব্রিজ ছিল তাদের লুকিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান জায়গা। তাদের নামানুসারে পরে ব্রিজটার নামকরণ করা হয় ফেয়ারি ব্রিজ।'

রবিন বলল, 'আছে নাকি ব্রিজটা এখনও? গেলে খুঁজে দেখা যেত বামনরা এখনও আছে নাকি।'

শুনে হাসল কিশোর আর এরিনা।

কিন্তু আঁতকে উঠল মুসা। 'না না দরকার নেই! ওসব বামন-ফামন কিংবা ভূতপ্রেতের চেয়ে ভেড়া আর রত্নচোররা অনেক ভাল। ওদের অন্তত চোখে দেখা যায়।'

এরপর ওরা বাগানে ঘুরতে বেরোল। সবাই গল্প করছে, কিশোর ছাড়া। কিসের চিন্তায় যেন ডুবে আছে ও। শেষে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি ভাবছ এত, কিশোর? সেই গোলাবাড়িতে গিয়ে আবার তদন্ত চালানোর কথা ভাবছ না তো? পুলিশ ব্যাপারটা পছন্দ করবে না বলে সাহস পাচ্ছ না।'

'ঠিক ধরেছ।'

'পুলিশের গুল্লি মারো। চলো তো যাই,' বলল রবিন।

ম্লান হাসল কিশোর। 'পুলিশের সঙ্গে এরই মধ্যে অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে। লেডি ওয়াগনারের অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারছি না আমি।'

কিন্তু রাজি হয়ে গেলেন লেডি ওয়াগনার। বললেন, 'তুমি যে খুব বড় মাপের গোয়েন্দা আমি সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি, কিশোর। আর হারানো ব্রোচ, ভেড়াচোর এবং জাল চেকের রহস্য এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, তা-ও জানি। এ রহস্যের সমাধান করতে পারবে যদি বুঝে থাকো, যাও, বাধা দেব না। পুলিশকে আমি সামলাব।'

অনুমতি পাওয়া গেছে। মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা।

শর্টকাট রাস্তা ধরে লুকানো উপত্যকায় পৌঁছানোর পরামর্শ দিল এরিনা। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।

এরিনার নির্দেশ মত মেইন রোড ছেড়ে একটা নির্জন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। দূরে ধোঁয়া চোখে পড়ল। পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আগুন লেগেছে কোথাও।

একটা মোড় ঘুরতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। একটা পাহাড়ের উতরাইতে দাউ দাউ করে জ্বলছে শুকনো চারা গাছের ঝাড়।

চেঁচিয়ে উঠল এরিনা, 'ওই আগুন নেভাতে হবে! ঝাড়ু লাগবে।'

সতেরো

'ঝাড়ু!' অবাক হলো মুসা। 'ঝাড়ু দিয়ে আগুন নেভাবে কিভাবে?'

'কিভাবে নেভাই একটু পরেই তা দেখতে পাবে,' বলল এরিনা। 'কিশোর, আরও জোরে চালাও। বড় গাছগুলোর ওপর হামলা চালানোর আগেই নিভিয়ে ফেলতে হবে আগুন।'

কিশোর কোন প্রশ্ন করল না। গতি বাড়িয়ে দিল। এক সময় এরিনা বলল, 'এবার স্পীড কমাও। ঝাড়ুর কাছে চলে এসেছি আমরা।'

একটা মাঠের সামনে গাড়ি থামাল কিশোর। মাঠের এক কোনায়, কাঠের খুঁটিতে লাগানো হুকে বেশ কয়েকটা ঝাড়ু ঝুলে আছে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল এরিনা। এক ছুটে খুঁটিটার কাছে গিয়ে আরেক ছুটে ফিরে এল গাড়ির কাছে। হাতে চারটা ঝাড়ু। ওগুলো বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'এগুলো বার্চের ডাল দিয়ে তৈরি। শক্ত তার দিয়ে মোড়ানো। আগুন নেভাতে খুব কাজে লাগে। তাই সব সময় এই ঝাড়ু মাঠে প্রস্তুত রাখা হয়।'

কত দেশের কত রীতি, কত কায়দা! আজব মনে হলো মুসার। তবে এ সব নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই এখন।

আবার দ্রুত গাড়ি ছোটাল কিশোর। এরিনা বলল ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে নেভাতে হবে আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের ধারে পৌঁছে গেল ওরা। চারা গাছগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

'ভাগ হয়ে যাব আমরা,' নির্দেশ দিল এরিনা। 'উতরাইয়ের কিনারার বাইরের দিকের আগুন নেভাব। গায়ে আগুনের তাপ লাগবে। কিন্তু করার কিছু নেই।'

ঝাড়ু নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন নেভাতে। আধঘণ্টার মধ্যে উতরাইয়ের মাঝখানের আগুন নিভিয়ে ফেলল। বড় গাছগুলোকে আগুনের ছোবলের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওরা।

ক্লান্ত হয়ে গেছে সবাই কঠিন কাজটা করতে গিয়ে।

মুসার ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। কিন্তু ছাই আর অঙ্গারের মধ্যে শোয়া যাবে না। ওরা গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

চারজনেরই মুখ লাল। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। হাতের কয়েক জায়গায় ফোস্কাও পড়েছে। জামা-কাপড় ধুলো আর ছাইতে দৈন্য দশা, জুতোর রং তো চেনাই যায় না।

রবিন বলল, 'চেহারার যা দশা হয়েছে একেকজনের। এখন কারও সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি।'

মলিন হাসি হাসল মুসা। 'তোমার আশা পূরণ হচ্ছে না, রবিন। ওই দেখো কারা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

কিশোরের গাড়ির পেছনে থেমে আছে আরেকটা গাড়ি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেই দু'জন পুলিশ অফিসার।

'ক্রুগার আর পিটার। ওরা কোত্থেকে!' অবাক হলো রবিন।

হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তায় উঠে এল চারজন। বিস্মিত হয়ে ওদের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসাররা। কিশোরই ঘটনাটা খুলে বলল। আগুন নেভানোর জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব দিল এরিনাকে।

'তোমরা যে আগুন নেভাতে পেরেছ এই-ই ঢের,' প্রশংসা করল কাঠখোট্টা পিটার।

'ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি বলে কাজটা করতে পেরেছি,' কিশোর বলল। পা বাড়াল নিজের গাড়ির দিকে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পিটার, তারপর এগিয়ে গেল কিশোরের দিকে। 'আমি দুঃখিত, কিশোর। তোমাকে খামোকাই সন্দেহ করেছিলাম। কোন খারাপ লোক আর যা-ই করুক বনের আগুন নেভাতে যাবে না জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।'

কিশোর হাসল তার দিকে তাকিয়ে। 'আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আপনার ডিউটি পালন করেছেন মাত্র।'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল পিটার। তার সঙ্গী মুচকি মুচকি হাসছে।

গাড়িতে চড়ে বসল কিশোররা। পুলিশ অফিসারদের বিদায় জানাল হাত নেড়ে। ওরা তখন আগুন কতটুকু নিভেছে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। গাড়ি ছুটিয়ে দিল কিশোর।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি থামাতে বলল এরিনা। জানাল, 'এখান থেকে পাহাড়ে উঠব আমরা। উপত্যকা এবং গোলাবাড়ি সবই দেখা যাবে এ জায়গা থেকে।'

এরিনা এদিকের রাস্তাঘাট ভালই চেনে। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে একটা পায়েচলা পথে চলে এল ও। পথটা সোজা চলে গেছে উতরাইয়ের দিকে। কিশোর সন্দেহ করল এ পথটাকেই হয়তো চুরি করা ভেড়া পাচার করার রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর বোলাল ওরা। চোখে পড়ল না কাউকে। গোলাবাড়িতে ঢুকল কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু কোন সূত্র পেল না।

'সব জায়গাতেই খোঁজ করেছি,' বলল রবিন, 'শুধু ডোর ইয়ার্ডের ছাইয়ের পাঁজা ছাড়া।'

লম্বা ডাল দিয়ে ছাইয়ের পাঁজা খুঁচিয়ে দেখল সে আর মুসা। নিচে টিনের ক্যান, কলার খোসা আর ভাঙা কাঁচের টুকরো ছাড়া কিছুই পেল না।

'নকল মেষপালক হাউসকীপার হিসেবে ভালই ছিল বলতে হবে,' বলল মুসা। 'কি সুন্দর ফিটফাট রেখে গেছে ঘর-দোর।'

কথাটা কানে গেল কিশোরের। প্রশ্ন জাগল মনে, যে লোকের চলে যাবার তাড়া ছিল সে কেন ঘরদোর ফিটফাট করে রেখে যাবে?

মুসা এখনও আবিষ্কারের নেশায় ছাইয়ের পাঁজা খুঁজে চলেছে। একটা ছোট ক্যানভাস পেয়ে গেল ও, একটা বোর্ডের সাথে পেরেক মারা। ক্যানভাসে কে যেন

রং করে রেখেছে। কাঁচা হাতের কাজ।

'কি এটা?' আপন মনেই প্রশ্ন করল মুসা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যানভাসের দিকে। তারপর ঠেলে সরিয়ে রাখল ওটা।

কিশোর তুলে নিল ক্যানভাসটা। আবর্জনার স্তূপ থেকে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে এটা তার থেকে একটু অন্যরকম। ওর মনে হচ্ছে ক্যানভাসটার কোন গুরুত্ব আছে। গুরুত্বটা কিসের এ মুহূর্তে বুঝতে না পারলেও জিনিসটা নিজের কাছে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

আবর্জনা একত্র করে তার ওপর আবার স্তূপ করা হলো ছাই। কিশোর প্রস্তাব দিল এবার একটু বিরতি নেয়া যায়। 'বাড়ি ফিরি চলো।'

ফেরার পথে চুপ হয়ে রইল কিশোর। চিন্তামগ্ন। বাড়ি ফিরে ক্যানভাসটা নিয়ে পরীক্ষা করবে ঠিক করল। গোসল সেরে নেমে পড়ল আয়না সংগ্রহের খোঁজে।

কিশোরকে অনেকক্ষণ লাপাত্তা দেখে এরিনা, মুসা আর রবিন ঢুকল লেডি ওয়াগনারের বসার ঘরে। দেখল গোয়েন্দাপ্রধান ঝুঁকে আছে একটা টেবিলের ওপর। টেবিলে ক্যানভাসটা মেলে রেখেছে। মাঝখানে কতগুলো আয়না সাজানো। আয়নার একটা চক্র বানিয়েছে।

'কি করছ, কিশোর?' জানতে চাইল মুসা।

'এই যে ক্যানভাসটা,' জবাব দিল কিশোর, 'বহু রঙা এই ক্যানভাসটাকে ভালমত লক্ষ করো। প্রথম দর্শনে মনে হবে এতে জ্যাবরা-থ্যাবরা কিছু রং ছাড়া কিছু নেই। বোনি প্রিন্স চার্লির যে ছবিটা দেখেছিলাম মিউজিয়ামে, মনে আছে? এটাও অনেকটা সে-রকম। সেই ছবিতে সিলিন্ডারের গায়ে তৈরি করা আয়নায় ছবিটা দেখা যাচ্ছিল। মনে নেই?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই। মনে আছে। ক্যানভাসে রাখা আয়নাগুলোতে ছবি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখতে পেল না।

লেডি ওয়াগনারও চেষ্টা করলেন। তিনিও কিছু বের করতে পারলেন না। 'কিশোরের সঙ্গে আমিও একমত, কোন কিছু আছে এটাতে। কিন্তু সেটা বের করব কিভাবে?'

'মনে হচ্ছে এ সব সাধারণ আয়না দিয়ে দেখা যাবে না,' কিশোর বলল। 'বাড়িতে কাঁচের তৈরি টিউবের মত কোন জিনিস আছে?'

লেডি ওয়াগনার তেমন কোন জিনিসের কথা মনে করতে পারলেন না। কিশোরকে বললেন খুঁজে দেখতে।

ক্যানভাসটা হাতে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। একতলায়, আলমারির মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের একটা বড়সড় গবলিট পেয়ে গেল সে। পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলোকে।

'একেবারে ঠিক সাইজের জিনিস পেয়ে গেছি,' খুশি হলো কিশোর। 'এখন আমার বুদ্ধি কাজে লাগলেই হলো।'

লেডি ওয়াগনারের কাছে ফিরে এল ও। গবলিটের ভেতরের দেয়ালে পারদ মাখিয়ে ওটাকে আয়না বানানোর অনুমতি চাইল।

'ঠিক আছে। বানাও,' অনুমতি দিলেন লেডি ওয়াগনার। 'হেনরি তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবে। ওর কাছে নানা অদ্ভুত জিনিস থাকে। পারদও থাকতে পারে।'

কিন্তু হেনরির কাছে পারদ নেই। কিশোর ঠিক করল ফোর্ট উইলিয়ামে যাবে। পারদ কিনে আনবে। সেই সাথে কিছু কোটিং।

বন্ধুরা যেতে চাইল ওর সঙ্গে। আপত্তি নেই কিশোরের। সবাই মিলে রওনা হয়ে গেল। মেইন স্ট্রীটে এসেছে, উত্তেজিত গলায় বলে উঠল কিশোর, 'ওই দেখো। সেই লাল-দাড়ি।'

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বাকি তিনজনও।

'তাই তো,' বলল রবিন। 'ব্যাটা অন্য গাড়ি চড়ে যাচ্ছে।'

দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর। এবার আর লাল-দাড়িকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেবে না। পিছু নিল। লোকটার গাড়ির লাইসেন্স নম্বরও মুখস্থ করে নিল।

দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা। বাধ্য হয়ে কিশোরকেও গতি বাড়াতে হলো। পেট্রল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই গেছি, মনে মনে ভাবল কিশোর। কিন্তু ওরা শহরের বাইরে চলে এসেছে। পেট্রল পুলিশ চোখে পড়ল না। চলল অনুসরণ।

লাল-দাড়ি বোধহয় বুঝতে পেরেছে তার পিছু নেয়া হয়েছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল সে। তীব্র বেগে ছুটতে লাগল তার গাড়ি। কিন্তু কিশোর তার পেছনে জোঁকের মত সেঁটে রইল।

দক্ষিণ দিকে চলেছে ওরা। লক লোমোন্ডের রাস্তা ওদিকেই।

'হাউসবোটে যাচ্ছে বোধহয়,' মন্তব্য করল রবিন।

মুসা বলল, 'এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। এক ঘুষিতে ওর নাক ভেঙে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা না।'

হাসতে গিয়েও হাসল না কিশোর। মুখ গোমড়া হয়ে গেছে ওর গ্যাস গজের দিকে চোখে পড়তে। ওটা খালি। তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে কিশোর বলল, 'ইস্! তেল শেষ! এবারেও ধরা হলো না ওকে।'

আঠারো

কিশোরের কথা মাত্র শেষ হয়েছে, খকখক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতাশায় গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রবিন। 'কি আর করা। গাড়িটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা খেয়াল করলাম না কেন।'

জবাবে কিশোর কিছু বলল না। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও, দৌড় দিল একটা বাড়ি লক্ষ্য করে। দরজার কড়া নাড়ল। সুন্দরী, হাসিখুশি চেহারার এক মহিলা খুলে দিল দরজা।

জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? পুলিশে খবর দেব।'

সন্দিহান চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তারপর হেসে বলল, 'তুমিই সেই বাংলাদেশী কিশোর গোয়েন্দা, না? ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনালে ছবি দেখেছি তোমার।'

'জ্বী-হ্যাঁ, আমিই সেই,' জবাবে কিশোরও হাসল। বেশি কথার মধ্যে গেল না।

মহিলা ভেতরে আসতে বলল কিশোরকে। হলঘরের টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা দেখিয়ে দিল। স্থানীয় থানায় কিভাবে যোগাযোগ করবে সে-ব্যাপারে কিশোর সাহায্য চাইল মহিলার কাছে। মহিলা ফোন ধরে দিল। ও ধার থেকে জবাব দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

'জ্বী, বলুন?'

লাল-দাড়ির কথা জানাল সুপারিনটেনডেন্টকে কিশোর। বলল ওর সন্দেহ লোকটা ভেড়াচোর। 'ইন্সপেক্টর ক্রুগার এবং পিটার চেনেন আমাকে,' শেষে যোগ করল ও।

'তোমার গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং তো,' বললেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জেমস অ্যালিস্টার। বোঝা গেল কিশোরের কথা বিশ্বাস করছেন না তিনি।

কিশোর অনুনয় করল, 'আপনি লোকটাকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন, প্লীজ!' অ্যালিস্টারকে গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার দিল সে। 'লোকটাকে ধরতে পারলে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবেন? আমি ওকে সনাক্ত করতে পারব।'

এতক্ষণে বিশ্বাস হলো বোধহয় অ্যালিস্টারের। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এখনই ওকে ধরার ব্যবস্থা করছি। তুমি এখানে চলে এসো। আরও কথা আছে মনে হচ্ছে তোমার। সবটা শোনা যাক।'

'আচ্ছা,' বলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঠিকানা জেনে নিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। মিসেস টেনর, মানে যার বাড়িতে ঢুকে ফোন করেছে কিশোর, তার কাছে পেট্রল সার্ভিসের নম্বর জানতে চাইল। নম্বর জেনে পেট্রল সার্ভিসকে ফোন করল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল পেট্রল সার্ভিসের জন্যে।

মিসেস টেনর কৌতূহল প্রকাশ করল লাল-দাড়ির ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোক কি তোমার কোন কেসের সঙ্গে জড়িয়েছে?'

কিশোর সংক্ষেপে জানাল, 'আমি ফোর্ট উইলিয়ামে লেডি ওয়াগনারের ওখানে উঠেছি। আপনি বোধহয় জানেন ওই এলাকা থেকে বেশ কিছুদিন ধরে ভেড়া চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা লাল দাড়িওয়ালা যে লোকটার কথা বললাম, সে ভেড়াচোরদের সঙ্গে জড়িত।'

কিশোরের জবাব সন্তুষ্ট করল মহিলাকে। বলল, ' লেডি ওয়াগনারের সঙ্গে যে দেখা করতে আসছ তুমি সেটা কাগজে পড়েছি।'

'তারমানে আমার কোন খবরই আর অজানা নেই এ অঞ্চলে,' তিক্ত হাসি হাসল কিশোর। 'আমার এক বন্ধু আমার একটা ছবি ছেপে দিয়েছিল পত্রিকায়।

সেটাই হয়েছে কাল। আমার সেই বন্ধুটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আরও দু'জনের সঙ্গে। আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল ও। পার্স বের করল। ফোনের বিল দেয়ার জন্যে।

রীতিমত আপত্তি জানাল মহিলা। 'আরে না না। টাকা দেবে কি! তোমার মত গোয়েন্দার সাথে যে পরিচিত হলাম সেই তো আমার সাত কপালের ভাগ্যি। এই বয়েসে যে কেউ শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারোর মত গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারে সেটাই আমার জানা ছিল না।'

'এবার কিন্তু সত্যি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।' মহিলাকে আর টাকা সাধল না কিশোর।

মিসেস টেনর এগিয়ে দিতে গেল কিশোরকে।

এমন সময় বড় এক ক্যান পেট্রল নিয়ে হাজির হয়ে গেল পেট্রল সার্ভিসের লোক। কিশোরের গাড়ির ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালল। বন্ধুদের সঙ্গে মিসেস টেনরের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে।

কিশোর ওয়াগনার হাউসের দিকে যাচ্ছে না দেখে অবাক হলো রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'থানায়,' সংক্ষেপে জবাব দিল কিশোর।

থানায় ঢুকেই খুশি হয়ে উঠল ওরা। অবশেষে ওদের পরিশ্রম সফল হয়েছে। ধরা পড়েছে লাল-দাড়ি। সুপারিনটেনডেন্ট অ্যালিস্টারের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচাচ্ছে গাঁক গাঁক করে। নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

'আমি ওয়ারেন স্টোন। একজন আমেরিকান। খামোকা আপনারা আমাকে ধরে এনেছেন। ছেড়ে দিন এখুনি। নইলে পরে পস্তাবেন বলে দিচ্ছি,' হুমকি দিতে লাগল লোকটা।

মুসা, রবিন ও এরিনা ঘরের পেছন দিকে গিয়ে বসল। কিশোর এগিয়ে গেল সামনে। লাল-দাড়ির কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন অ্যালিস্টার। 'তুমি কিশোর পাশা?'

নামটা শোনামাত্র পাক খেয়ে ঘুরল লাল-দাড়ি, মুখোমুখি হয়ে গেল কিশোরের। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। অফিসার বললেন, 'কিশোর পাশাকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?'

চমকে যাওয়াটা দ্রুত সামলে নিল ওয়ারেন স্টোন। চেঁচিয়ে উঠল, 'একে জীবনে দেখিনি আমি।'

একজন কনস্টেবল ঢুকল ঘরে। রবিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'ওই লাল-দাড়ি লোকটা ছদ্মবেশী। নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়েছে।'

কনস্টেবল শুনে কিছু বলল না। হাসল শুধু। মিস্টার অ্যালিস্টারের কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলল।

'তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি,' বললেন অ্যালিস্টার। কনস্টেবলকে আদেশ

দিলেন আসামীর দাড়ি গোঁফ পরীক্ষা করে দেখতে, ওগুলো আসল না নকল।

ভয়ানক আপত্তি জানাল ওয়ারেন স্টোন। কিন্তু লাভ হলো না। তার দাড়ি ধরে টান মারতেই মুখ থেকে খুলে এল ওটা। দেখা গেল গোঁফও নকল। এমনকি মাথার চুলও। উইগ পরেছিল সে। তার চুলের রং আসলে কালো।

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'আরে, এ তো কিম ব্রাগনার! রকি বীচে দেখেছি একে।'

মুসা, রবিন আর এরিনাও এগিয়ে এল নকল লোকটাকে দেখতে। উত্তেজিত হয়ে ওরা ওকে নিয়ে কথা বলছে, হাত তুলে সবাইকে থামতে বললেন অ্যালিস্টার। বললেন, 'কিশোর পাশা, তোমার গল্পটা শোনাও তো।'

প্রথম থেকে শুরু করল কিশোর। জানাল এই কিম ব্রাগনার কৌশলে তার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছিল। 'লোকটাকে রকি বীচে এক নজর দেখেছিলাম আমি। এজন্যেই এডিনবার্গে ওকে চেনা চেনা লাগছিল। ও-ই আমাদের পিছু নিয়েছিল। তখন অবশ্য ছদ্মবেশে ছিল সে।'

কিশোর জানাল হারানো জিনিসের খোঁজে স্কটল্যান্ডে এসেছে ওরা। তার সন্দেহ কিম ব্রাগনার নিজে অথবা তার দলের লোক ওটা চুরি করেছে।

'আমি কিছু চুরি করিনি,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কিম।

কিশোর ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। সে তার কথা বলে যেতে লাগল। বলল ভেড়াচোরের দল নিয়ে কিভাবে ওর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, কিভাবে গোপন কোড মেসেজের মাধ্যমে প্রথমে হাউসবোটে চোরের সন্ধান পায়, তারপর পায় বেন নেভিসের গোলাবাড়িতে।

কিম ব্রাগনারের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'তুমি কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

মিস্টার অ্যালিস্টারের দিকে ফিরল কিশোর। 'এই কিম একটা ব্যাপার অস্বীকার করতে পারবে না যে আমার একটা অটোগ্রাফ তার দখলে আছে। আমার ধারণা, কিমের দলের কোন একজনের বউ আমার সই জাল করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছে। হয় মহিলার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে, চুলটুল কেটে নিয়ে ছেলে সেজে ব্যাংকে গিয়েছে, নয়তো স্রেফ ছদ্মবেশ নিয়ে কাজটা করেছে সে।'

সুপারিনটেনডেন্ট কটমট করে তাকালেন আসামীর দিকে। 'এ অভিযোগের ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে?'

'কিছুই না। কারণ এ ছেলে যা বলছে তার কোনটাই সত্যি নয়। আমি কিম ব্রাগনারই নই। আমাকে ছেড়ে দেয়া হোক।'

তবে নিজের সঠিক পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হলো সে। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন কিমের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেগুলোর স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে কিমকে সহজেই হাজতে ঢোকানো যেতে পারে। জামিনও পাবে না সে।

মিস্টার অ্যালিস্টারের নির্দেশে পুলিশ কিম ব্রাগনারকে নিয়ে গিয়ে হাজতে

ভরল। পরে জেলে পাঠানো হবে। তিনি কিশোরকে আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, 'সত্যি, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, কিশোর পাশা!'

প্রশংসা সব সময়ই বিব্রত করে কিশোরকে। লজ্জায় লাল হলো সে। বলল, 'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? আমাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে লেডি ওয়াগনার নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।'

'অবশ্যই করতে পারো,' বললেন অ্যালিস্টার।

প্রাসাদে ফিরে এল গোয়েন্দারা।

সমস্ত ঘটনা শুনে লেডি ওয়াগনার তো অবাক। কিশোররা ফিরে যেতে তৈরি হলো। এ সময় একজন কনস্টেবল ঢুকল ঘরে। কিছুক্ষণ আগে কিমকে জেলে ঢোকাতে গিয়েছিল এ লোক।

'আসামী তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়,' বলল সে।

'কি কথা?' জানতে চাইল কিশোর।

'তা বলতে পারছি না।'

সুপারিনটেনডেন্ট নিজে কিশোরদেরকে কিমের কাছে নিয়ে গেলেন।

ওদের দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হলো কিমের মুখ। 'আমি আগেও বলেছি কোন অপরাধ আমি করিনি, এখনও বলছি। তবে হারানো ব্রৌচটা কোথায় আছে জানি আমি। আমাকে ছেড়ে দিলে বলব।'

কিমের কথা শুনে গোয়েন্দারা অবাক। একযোগে ঘুরল মিস্টার অ্যালিস্টারের দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তাঁর।

তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, 'তোমাকে এ সময়ে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তবে হারানো ব্রৌচ সম্পর্কে সত্যি কথা বললে তোমার ব্যাপারটা আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

শ্রাগ করল কিম। 'ঠিক আছে, বলছি। ব্রৌচটা চুরি করেছে লেডি ওয়াগনারের বাটলার হেনরি।'

উনিশ

'হেনরি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, হতবাক। 'ব্রৌচ সে চুরি করতেই পারে না!'

মুখ বাঁকাল কিম। 'তোমাদের ধারণা বাটলার খুব সৎ মানুষ। খোঁজ নিয়ে দেখলেই জানতে পারবে আসলে সে কি।'

কিমের কথা শুনে অবাক কিশোর আর তার বন্ধুরা। হেনরি চোর বিশ্বাস করতে সায় দিচ্ছে না মন। অবশ্য কতটুকুই বা চেনে ওরা লোকটাকে।

'ঠিক আছে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি,' বলল রবিন।

রবিনের কথায় সায় জানাল কিশোর।

ওরা থানা থেকে বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠল। ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে

গাড়ি ছোটাল কিশোর। মাঝ পথে শুধু একটা দোকানের সামনে এক মিনিটের জন্যে থামল। এরিনাকে পাঠিয়ে পারদ আর পেইন্ট ব্রাশ কিনে আনাল।

প্রাসাদে পৌঁছেই ওরা ছুটল লেডি ওয়াগনারের ঘরে। হেনরি সম্পর্কে যা শুনেছে খুলে বলল সব।

'কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'হেনরি এখানে বহু বছর ধরে আছে। ওর সততা সম্পর্কে কোন দিন প্রশ্ন তুলিনি।'

তবু হেনরিকে এ ব্যাপারে একবার জিজ্ঞেস করবেন ঠিক করলেন তিনি। হেনরি জানে না কিসের জন্যে ডাকা হয়েছে তাকে, হাসিমুখে ঘরে ঢুকল সে।

'তোমাকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছে', ইতস্তত করে বললেন লেডি ওয়াগনার, 'তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না। একজন অভিযোগ করেছে কিশোরের চাচী মেরিকে যে পোখরাজ বসানো ব্রোচটা আমি দিতে চেয়েছিলাম ওটা নাকি তুমি নিয়েছ?'

শুনে মুখ সাদা হয়ে গেল হেনরির। কাঁপতে শুরু করল। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। লোকটার জন্যে মায়া লাগল কিশোরের। কিন্তু কিছু বলল না। যা বলার লেডি ওয়াগনারই বলবেন।

অবশেষে নিজেকে সামলে নিল হেনরি। 'লেডি ওয়াগনার,' দৃঢ় গলায় বলল সে, 'আমি আপনার ব্রোচ নিইনি। ওটার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কে এ ধরনের নোংরা অভিযোগ করেছে জানি না তবে আমার ধারণা ওই লোক নিজের অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার জন্যেই এমন কাজ করেছে।'

বিশ্বস্ত কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'তোমার কাছ থেকে এ রকম জবাবই আশা করেছিলাম, হেনরি। জানতাম এ কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

হেনরিকে কিম ব্রাগনারের কথা জানাল কিশোর। বলল, 'লোকটার কাছ থেকে পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলে আমরা হারানো ব্রোচ রহস্যের সমাধান করতে পারব বলে আশা রাখি।'

হেনরিকে যে বিশ্বাস করে কিশোর সেটা বোঝানোর জন্যে গবলিট দিয়ে আয়না তৈরির ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে বসল তার কাছে। আয়না দিয়ে কি হবে বুঝতে পারল না হেনরি। যখন শুনল এ দিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে, সাহায্য করার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। কিছুক্ষণের মধ্যে, গবলিটে পারদ মাখিয়ে ওটা শুকিয়ে ফেলল হেনরি। গবলিটের রূপান্তর ঘটল সিলিন্ডার আয়নায়। এখন এটা দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

গবলিট আয়না ক্যানভাসের বোর্ডের মাঝখানে উল্টো করে বসাল কিশোর। লেডি ওয়াগনার, হেনরি এবং অন্যান্যরা আগ্রহ নিয়ে দেখছে কিশোরের কাণ্ড। জ্যাবরা থ্যাবরা রং-এর মাঝ দিয়ে আয়নায় ফুটে উঠল একটা পাথুরে টাওয়ারের প্রতিচ্ছবি।

'টাওয়ারটা কিসের বলতে পারবেন?' লেডি ওয়াগনারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

লেডি ওয়াগনার টাওয়ারের প্রতিচ্ছবির দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন তার ধারণা ওটা কোন প্রাচীন দালানের ধ্বংসাবশেষ হবে। হেনরিও সমর্থন করল তাকে।

বলল, 'এ জায়গাটা আমি চিনি। পরিত্যক্ত এক জায়গায় টাওয়ারটার অবস্থান। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। টাওয়ার দেখতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি।'

'অবশ্যই যাব,' খুশি হলো কিশোর। 'এ জায়গায় ভেড়াচোররা থাকতে পারে। এটা ওদের আরেকটা আস্তানা হওয়াও বিচিত্র নয়।'

পর দিনই টাওয়ার দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। হেনরি জানাল ধ্বংসাবশেষটাকে তার বিচিত্র আকৃতির জন্যে 'মৌচাক' বলে লোকে। কেউ বলে ব্রচ। শত শত বছর আগের টাওয়ার ওটা।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই রওনা হয়ে গেল ওরা। হেনরির নির্দেশে সরু একটা মেঠো পথ দিয়ে গাড়ি চালাল কিশোর। মিনিট বিশেক পরে পাথুরে টাওয়ারটা দেখতে পেল ওরা।

'সত্যি মৌচাকের মত লাগছে দেখতে,' মন্তব্য করল মুসা।

গাড়ি থামাল কিশোর। হেনরি ওদেরকে নিয়ে পা বাড়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত টাওয়ারের দিকে। একটা মাঠ পার হয়ে গন্তব্যে চলে এল কিশোররা। অদ্ভুত আকৃতির টাওয়ারটার কোন জানালা নেই। বিভিন্ন সাইজের পাথর দিয়ে তৈরি। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু।

হেনরি বলল, 'এক সময় টাওয়ারটা আরও উঁচু ছিল। ভেঙেচুরে এখন শুধু সামনের অংশটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।'

আগে আগে চলল হেনরি। সরু একটা খোলা জায়গা। ব্রচে ঢোকার একমাত্র পথ। প্যাসেজটা বড় জোর দুই ফুট চওড়া। দশ ফুট পুরু দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মত চলে গেছে।

পাথরের অসাধারণ কারুকাজগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'সাংঘাতিক দেখতে!'

একটু পর পরই পাথরের আয়তাকার ফাটল। পাথরের ফলক দিয়ে বন্ধ করা। মেঝের মত লাগছে দেখতে।

'এই ছোট ঘরগুলো কোন কাজে ব্যবহার করা হতো?' জানতে চাইল মুসা।

হেনরি বলল ইতিহাসবিদদের নিজেদের কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। কারও মতে শত্রু পক্ষের হামলার সময় গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা ঢুকে পড়ত ব্রচে, বন্ধ করে দিত প্রবেশ পথ, বিপদ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকত।

'হয়তো পুরো একটা পরিবার আশ্রয় নিত এ ধরনের ছোট ঘরে,' বলে চলল হেনরি। 'এদিকে একটা গ্যালারি ছিল গোল পেঁচানো সিঁড়িসহ। প্রতি তলাতেই অধিবাসীরা যেতে পারত। মাঝখানে বড় একটা চুলাও ছিল রান্না করার জন্যে। এসো, তোমাদের একটা জিনিস দেখাই।'

কিশোরদেরকে নিয়ে একটা নিচু দেয়ালের সামনে চলে এল হেনরি। আঙুল

তুলে দেয়ালের নিচে দেখাল। 'ওখানে কুয়া ছিল। কুয়া থেকে লোকে পানি তুলত।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এই মৌচাক তো ছিল নিরেট পাথরের তৈরি, চারপাশ দিয়ে আটকানো। মানুষ শ্বাস নিত কিভাবে?'

হেনরি বলল, 'বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের ধারণা, টাওয়ারের চূড়া ছিল খোলা আর জাফরি কাটা। সেখান দিয়ে চলাচল করত বাতাস। ফলে শ্বাস নিতে সমস্যা হতো না।'

'লোকে আরামেই থাকত মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল মুসা।

'থেকে দেখবে নাকি?' হাসল রবিন।

দু'হাত নাড়ল মুসা। 'না না, ওসব করতে যাচ্ছি না। আমার কাছে হোটেলই ভাল।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠল অন্যরা। সূত্রের আশায় খোঁজাখুঁজি করতে লাগল কিশোর। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

'এখানে কারও গোপন আস্তানা থাকার কোন আলামত তো পাচ্ছি না,' শেষে বলল সে।

এরিনা ঘুরল হেনরির দিকে। 'এদিকে আর কোন ব্রচ আছে?'

হেনরি মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল আছে। কিশোর গোঁ ধরল সেখানে যাবে। হেনরির পিছু পিছু আরেকটা মৌচাকে হাজির হলো ওরা। শুরু করল তদন্ত। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান, 'কতগুলো লোম দেখতে পাচ্ছি এখানে। ভেড়ার চামড়াও আছে।'

'ভেড়াচোররা এ জায়গাটা ব্যবহার করে বলে সন্দেহ করছ?' জিজ্ঞেস করল এরিনা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'এই লোম আর চামড়া দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তারা বিক্রি বা জবাই করার জন্যে জ্যান্ত ভেড়া নিয়ে অন্য কোথাও যায় না। এখানে বসেই জবাই করে। শুধু লোম আর চামড়া দরকার ওদের।'

শুনে 'অঁক' করে উঠল রবিন। 'তার মানে এটা একটা কসাই খানা?'

কিশোর জবাবে কিছু বলল না। হেনরিকে খুঁজছে। আশপাশে না দেখে ধারণা করল হেনরিও ওদের মত তদন্তে নেমে পড়েছে। ঠিকই ধরেছে কিশোর। একটু পরেই ফিরে এল হেনরি। জানাল একটা বড় গর্তে প্রচুর হাড়গোড় দেখে এসেছে। তার ধারণা ওগুলো ভেড়ার কঙ্কালের অবশিষ্ট।

'তার মানে এটা শুধু কসাইখানা নয়, ভেড়াদের গোরস্তানও,' গম্ভীর হয়ে গেল রবিন।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, ভেড়াচোররা ভেড়া চুরি করে এনে লুকিয়ে রাখত উপত্যকায়, ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলত। তারপর ট্রাকে করে নিয়ে আসত এই ব্রচে। এখানে ভেড়াগুলোকে জবাই করত তারা, ছাল-চামড়া ছড়িয়ে, মাংস নিয়ে, নাড়ীভুঁড়িসহ বাকি অংশ মাটিতে পুঁতে ফেলত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে।

'এক্ষুণি একবার ওয়াগনার হাউসে যাওয়া দরকার,' কিশোর বলল। 'পুলিশকে ফোন করব।'

ঝড়ের বেগে বাড়ি ফিরে এল ওরা। থানায় ফোন করল কিশোর। ঘটনা শুনে অ্যালিস্টার বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রৌচে লোক পাঠিয়ে চোরগুলোকে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা করবেন।

'কোন খবর পেলেই জানাব তোমাকে,' প্রতিশ্রুতি দিলেন কিশোরকে।

পরদিন সকালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের ফোন এল। জানালেন, 'ব্রৌচে গিয়ে কাউকে ধরা যায়নি। তবে তোমার ধারণা অমূলক নয়। ক্লাইডের কাছে ডামবারটনে ইন্সপেক্টররা একটা অবৈধ শিপমেন্টের খবর পেয়েছে। ভেড়ার চামড়া আর লোম নিয়ে একটা ফ্রেইটার আমেরিকা গেছে।'

সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা শেষ করে বন্ধুদেরকে ডাকল কিশোর। 'ডামবারটন হলো লক লোমোন্ডের দক্ষিণে যেখানে হাউসবোটগুলো ছিল। আমি শিওর ধাওয়া খেয়ে কিম ব্রাগনার ওখানেই যাচ্ছিল।'

রবিন বলল, 'কিন্তু পেইশা বা অন্যদের তো খোঁজ পাওয়া গেল না। কোথায় তারা?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'ওরা গোলাবাড়িতে নেই, হাউসবোটে নেই, ব্রচেও নেই। আমার ধারণা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।'

'কার কাছ থেকে?' জিজ্ঞেস করল এরিনা।

'কিম ব্রাগনারের কাছ থেকে'।

কিশোরের জবাব শুনে অবাক হয়ে গেল ওরা। তবে গোয়েন্দাপ্রধানের কথায় যুক্তি আছে। পেইশার রুমের ব্যাগপাইপের সুরের কথা মনে পড়ে গেল মুসা আর রবিনের।

'ওই সময় কিমই বোধহয় ঘরে বসে বাঁশির সুর প্র্যাকটিস করছিল,' রবিন বলল। 'বেন নেভিসেও তো একই সুর বাজছিল।'

'এবার ওদের ধরা পড়তেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। 'লেডি ওয়াগনার, আমি চিলেকোঠায় আপনার মায়ের যে ঘাগরাটা দেখেছি, সেটা পরে ছদ্মবেশ নেব। মেয়ে দেখলে সহজে সন্দেহ করবে না চোরেরা। বেন নেভিস পাহাড়ে উঠে সেই জায়গায় যাব যেখান থেকে স্কটিস হোয়া হেই সুরটা বাজাচ্ছিল বংশীবাদক।'

'ওখানে গিয়ে কি করতে চাও?'

'বাঁশি বাজাব।'

'তুমি ওই সুর বাজাতে পারো?' অবাক হলেন লেডি ওয়াগনার।

কিশোর জানাল প্রথম কয়েকটা চরণ বাজাতে পারে ও। ভাল হয় না। 'তবে ওতেই আশা করি কাজ চলে যাবে। কারণ বংশীবাদককেও সব সময় গানের প্রথম চরণগুলোই বাজাতে শুনেছি। বাজানোও তেমন ভাল হয় না। একটা চ্যান্টারও দরকার হবে আমার শিস দেয়ার জন্যে। কারণ ভেড়াচোরদের দ্বিতীয় সঙ্কেত ছিল শিস। আমাকে একটা চ্যান্টার জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

গোটা ব্যাপারটাতে বেশ মজা পাচ্ছেন লেডি ওয়াগনার। বললেন, 'হেনরি আগে এক কারখানায় রীড মেকারের কাজ করত। ওর কাছে অনেক ব্যাগপাইপও আছে। যদিও যন্ত্রটা একদমই বাজাতে পারে না সে। আমি ওকে বলে দিচ্ছি ব্যাগপাইপ নিয়ে আসতে,' রশি ধরে টান দিয়ে ঘণ্টা বাজালেন তিনি।

একটু পরে ঘরে ঢুকল হেনরি। লেডি ওয়াগনারের কথা শুনে অবাক। কিশোরদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল সে। নিজের ছোট বসার ঘরে নিয়ে গেল সবাইকে। এখানেই ব্যাগপাইপ জমিয়ে রাখে সে

'খুব ভাল অবস্থায় আছে ব্যাগপাইপগুলো,' গর্বিত কণ্ঠে ঘোষণা করল সে। 'বাজিয়ে দেখো।'

মুচকি হাসল কিশোর। পরীক্ষা করতে বসে গেল। ঠিকই বলেছে হেনরি। ব্যাগপাইপগুলো সত্যিই ভাল অবস্থায় আছে। কিশোর হালকা একটা ব্যাগপাইপ বেছে নিল যাতে বয়ে নিতে কষ্ট না হয়। স্কটিস হোয়া হেইর সুর তুলল বাঁশিতে। পরপর কয়েকবার গানটার প্রথম চরণগুলো প্র্যাকটিস করল।

'শিস দেয়া যায় এমন একটা রীড বানিয়ে দেবেন আমাকে?' হেনরিকে অনুরোধ করল কিশোর।

'অবশ্যই দেব,' রাজি হলো হেনরি। 'এক ঘণ্টার মধ্যে পেলে চলবে?'

কিশোর বলল, 'খুব চলবে।'

লেডি ওয়াগনার ওদেরকে নিয়ে নিজের বসার ঘরে চলে এলেন। মুসা জানতে চাইল, 'তোমার পরিকল্পনাটা কি শুনি।'

হাসল কিশোর। 'ঠিক করেছি আজ সন্ধ্যায় আমরা চারজন মিলে বেন নেভিসের উপত্যকায় যাব। সূর্যাস্তের সময় আমি উঠে যাব পাহাড়ে, যেখানে বংশীবাদককে দেখেছিলাম। তারপর দুটো সঙ্কেতই দেব, হোয়া হেই বাজানো এবং শিস। যদি চোরের দল ওখানে থেকে থাকে–আমার ধারণা থাকবে–তাহলে আমার সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।'

'তোমার প্ল্যানটা দারুণ,' তারিফ করল মুসা। 'তবু মনে হয় নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাওয়া উচিত।'

লেডি ওয়াগনারও একই কথা বললেন। নিজেই ফোন করে দিলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে। অ্যালিস্টার জানালেন সন্ধ্যার আগেই দু'জন পুলিশ অফিসারকে ওয়াগনার হাউসে পাঠিয়ে দেবেন।

ঘণ্টাখানেক পর হেনরি রীড নিয়ে এল কিশোরের জন্যে। সাথে চ্যান্টার। জিনিস দুটো পেয়ে খুব খুশি কিশোর। তখনই বসে গেল শিস প্র্যাকটিসে।

নির্ধারিত সময়ে ওয়াগনার হাউসে পৌঁছে গেল দুই পুলিশ অফিসার–ক্রুগার আর পিটার। দু'জনের হাতেই দূরবীন।

ক্যারি সবার জন্যে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়ে দিল। দুটো গাড়িতে চড়ে রওনা হয়ে গেল দুই দল। ক্যাম্পসাইটে পৌঁছে আগে খেয়ে নিল ওরা, তারপর রহস্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল। বিকেলের আলো ম্লান হতে শুরু করেছে, এই সময় পাহাড়ে উঠতে শুরু করল সবাই।

ক্রুগারের হাতে কিশোরের ব্যাগপাইপ। নিচু গলায় কিশোরের সঙ্গে বকবক করে চলেছে সে। কিশোরের সাথে ভালই জমেছে তার।

গন্তব্যের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে ওরা, বাম দিকে পাথর আর গাছের আড়াল থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। ক্রুগারকে দাঁড়াতে বলে ব্যাপারটা কি দেখে আসার জন্যে নিজেই এগিয়ে গেল। দূর প্রান্তে, একটা ঝোপের ধারে একটা ভেড়ার বাচ্চা দেখতে পেল ও। অজ্ঞাত কারণে ভয়ে কাঁপছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছে। বাচ্চাটাকে দেখে মায়া লাগল কিশোরের। ওটাকে অভয় দেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল।

ঠিক তখনই টের পেল কেউ রয়েছে ওর পেছনে। ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কাছের একটা গাছের ডালে বসে আছে একটা প্রকাণ্ড বনবিড়াল। ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!

বিশ

বনবিড়ালটার শিকার ছিল ভেড়ার বাচ্চাটা। মাঝখানে কিশোর এসে পড়ায় ওটা ভয়ানক রেগে গেছে। ভেড়ার বদলে এখন ওকেই আক্রমণ করে বসবে নাকি কে জানে!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল কিশোরের। সে শুনেছে খুব জোরে চিৎকার করলে এবং পাথর ছুঁড়ে মারলে ভয়ে পালিয়ে যায় বনবিড়াল। চিৎকার করলে ভেড়াচোরেরা পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। বনবিড়ালটা তাকে প্রাণে মারতে না পারলেও আঁচড়ে খামচে মারাত্মক আহত করতে পারবে।

চিৎকার করে উঠল সে, 'যা। ভাগ। ভাগ বলছি!' পাথর খুঁজতে লাগল মরিয়া হয়ে। বড়সড় এক খণ্ড পাথর পেয়ে ছুঁড়ে মারল দাঁত মুখ খিঁচাতে থাকা হিংস্র প্রাণীটার দিকে।

ভড়কে গেল বনবিড়াল। ঝাঁপ দিল কিশোরকে সই করে। লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বনবিড়াল। তবে আর আক্রমণ চালাল না কিশোরের ওপর। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে গোটা দুই ধমক দিল। পরের বার বাগড়া দিলে আর ছাড়বে না বুঝিয়ে দিয়ে যেন সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে।

উত্তেজনা, চিৎকার, পাথর ছোঁড়া একসঙ্গে এত সব করে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে কিশোর। বড় বড় দম নিতে নিতে বসে পড়ল ভেড়ার বাচ্চাটার পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখানে এসেছিলি কেন মরতে? যা, মায়ের কাছে চলে যা।' বাচ্চাটার পিঠে আলতো চাপড় দিল সে।

উতরাইয়ের দিকে ছুটে চলে গেল বাচ্চাটা।

চিৎকার শুনে ছুটে এল মুসা, রবিন আর দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর। কি ঘটেছে ওদেরকে জানাল কিশোর। আশঙ্কা প্রকাশ করল চিৎকার শুনে ভেড়াচোরেরা পালিয়ে যেতে পারে।

'তবু চেষ্টা করে দেখি চোরগুলোকে ধরা যায় কিনা,' বলে উঠে পড়ল কিশোর।

দলবল নিয়ে পাহাড়চূড়ায় উঠে এল ও। কিশোরের হাতে ব্যাগপাইপ ধরিয়ে দিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ক্রুগার। একা হয়ে গেল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সুর তুলল বাঁশিতে।

দুই ইন্সপেক্টর চোখে দূরবীন লাগিয়ে চষে ফেলছে গোটা এলাকা। পাহাড় থেকে অনেক নিচে, একটা খাদের মধ্যে একপাল ভেড়া দেখতে পেল ওরা। ভেড়াগুলোর সঙ্গে চারজন মেষপালকও রয়েছে।

'দেখছেন কিছু?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মুসার হাতে দূরবীন তুলে দিল পিটার। যদি মেষপালকদের কাউকে চিনতে পারে। অনেকক্ষণ লোকগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল মুসা। তারপর উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'একজনকে চিনেছি! পেইশা!'

ঠিক ওই মুহূর্তে ক্রুগারের দূরবীনে ধরা পড়েছে একটা বড়সড় ট্রাক। থেমে আছে একটা মেঠো পথের ধারে। পিটারকে বলল, 'চলো, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে।' গোয়েন্দাদের বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। কিশোর, ঠিক বিশ মিনিট পর শিস দেয়া শুরু করবে।'

ক্রুগারের দিকে হাত বাড়াল রবিন, 'আপনার দূরবীনটাও দিয়ে যান। কি ঘটছে এখান থেকে দেখতে পারব তাহলে আমরা।'

ক্রুগার হেসে ওর দূরবীনটা দিয়ে দিল রবিনকে।

উতরাই বেয়ে নামতে শুরু করল দুই পুলিশ অফিসার।

ব্যাগপাইপের চ্যান্টার বদল করল কিশোর। ঘড়ির দিকে চোখ রাখল। রবিন দূরবীন দিয়ে ভেড়ার পালের ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত।

পার হয়ে গেল বিশ মিনিট। শিস বাজানো শুরু করল কিশোর।

দূরবীনে চোখ রেখে কি কি দেখছে কিশোরকে জানাতে লাগল রবিন। 'লোকগুলোর হাতে বন্দুকের মত কি যেন। ওগুলো দিয়ে স্প্রে করছে ভেড়াগুলোর ওপর।'

কিশোর, মুসা এবং এরিনা নিচের দৃশ্য অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মিনিটখানেক পরে ভেড়াগুলোকে টপাটপ মাটিতে পড়ে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওরা।

বিষ দিয়ে কুকুরকে মেরে ফেলার পর যেমন ভাবে গাড়িতে তোলে মিউনিসিপ্যালিটির লোক, তেমনি করে নিঃসাড় ভেড়াগুলোকে চ্যাংদোলা করে তুলে তুলে ট্রাকের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল লোকগুলো। দেখতে দেখতে ভরে গেল ট্রাক। স্টার্ট দিল গাড়ি। চলে যেতে শুরু করল।

ভয়ানক নিষ্ঠুর এই দৃশ্য দেখে বাকহারা হয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা।

গর্জে উঠল মুসা, 'পুলিশ অফিসাররা করছেটা কি? ধরছে না কেন ওদের?'

'হয়তো ওদের পিছু নেবে বলে ধরেনি,' কিশোর বলল।

ট্রাকটা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে।

'আর কিছু করার নেই এখানে,' আবার বলল কিশোর। 'ওয়াগনার হাউসে ফিরে যাই চলো। পুলিশের খবরের জন্যে অপেক্ষা করি।'

নিরাপদে অক্ষত শরীরে সবাইকে বাড়ি ফিরতে দেখে স্বস্তি পেলেন লেডি ওয়াগনার। সব শুনে অবাক হলেন। বললেন, 'খুব দেখালে তোমরা যা হোক।'

হাসল কিশোর। 'দেখানো এখনও শেষ হয়নি। হারানো ব্রেসলেটটা খুঁজে বের করা বাকি রয়ে গেছে।'

রাতে ঘুম হলো না কিশোরের। ক্রুগার আর পিটার কি করছে অনুমানের চেষ্টা করল। শেষে তার মনে হলো, 'ওরা অন্ধকারে ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করেছে ছবি তোলার জন্যে। ওগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে।'

পরদিন খুব সকালে ফোন এল কিশোরের কাছে। ও যা অনুমান করেছিল তা-ই ঘটেছে। ট্রাকের লোকজন ধরা পড়েছে, ভেড়া পাচারের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা শিকারও করেছে। সুপারিনটেনডেন্ট কিশোর এবং তার বন্ধুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় যেতে অনুরোধ করলেন। কিশোর তার বন্ধুদের নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল।

থানায় বসে সব রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। ক্রুগার আর পিটার জানাল কিভাবে তারা পিছু নিয়ে ট্রাকটাকে কব্জা করেছে। চোরদের প্রতিটা কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে রেখেছে ওরা। অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওই ছবিগুলোই।

চোরের শিরোমণি মিস্টার পেইশা রেগে আগুন। বারবার আফসোস করতে লাগল গ্লাসগো হোটেলে যদি তার নাম ভুল করা না হতো, নির্বোধ কিম ব্রাগনার তার বসকে খুশি করতে গেইলিক ভাষায় ভেড়া পাচারের কথা অনুবাদ না করত, তাহলে আর ওদেরকে ধরা পড়তে হতো না। জানা গেল, দরজা খোলা পেয়ে পেইশার ঘরে ঢুকেছিল কিম। হোটেলের ঝাড়ুদারনি দরজা খোলা রেখে নিচে গিয়েছিল আলমারি থেকে পরিষ্কার তোয়ালে আনতে। সেই ফাঁকে কিম ঘরে ঢুকে আলমারিতে মেসেজটা রেখে চলে আসে।

'তুমি,' কিশোরের দিকে ফিরে গরগর করে উঠল পেইশা, 'ইনভারনেস-শায়ারে যাতে আসতে না পারো সে-রকম নির্দেশ দিয়েছিলাম কিমকে। কিন্তু গাধাটা সে কাজটাকেও লেজেগোবরে করে দিয়েছে।'

কিশোর জানতে পারল রকি বীচে ওদের গাড়ির ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিয়েছিল এই কিম ব্রাগনারই, সে-ই পশমী কাপড়ে মুড়ে হুমকি পত্র পাঠিয়েছিল। ওকে ভয় দেখানোর জন্যে ডাকবক্সে বোমা রাখার জন্যেও দায়ী কিম। টমকে ফোনে হুমকি দিয়েছে সে-ই। স্কটল্যান্ডে কিশোরের গাড়ি খাদে ফেলে দেয়ার চেষ্টাও করেছিল কিম। ভেবেছিল কিশোরকে জখম করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারলে সে আর তদন্ত করতে পারবে না।

কিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে আসা হলো। ধমক দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট, 'যা যা করেছ, ভাল চাও তো সব খুলে বলো!'

জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল আমেরিকান লোকটা, 'তুমি খুব চালাক ছেলে, কিশোর পাশা। এতটা যে বিচ্ছু, কল্পনাই করতে পারিনি। তাহলে আরও সাবধান হতাম। হ্যাঁ, রকি বীচে পত্রিকায় তোমার গল্পটা আমিই সরবরাহ করেছিলাম যাতে আমার এবং পেইশার ওপর কেউ সন্দেহ করতে না পারে।' কি মনে পড়তে হাসল। 'তুমি খুব চালাক তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে একবার অন্তত আমার কাছে ধরা খেয়েছ। চুরি করা পাস নিয়ে এডিনবার্গে কোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকে কিভাবে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে?'

জবাব দিল না কিশোর।

জবাবের অপেক্ষায় থাকলও না কিম। বার বার সুপারিনটেনডেন্টের ধমক খেয়ে স্বীকার করল, আমেরিকায় পাচার হয়ে যাওয়া লোম আর ভেড়ার চামড়া দেখে রাখার দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত ছিল।

'যখন জানলাম তুমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল কিম, 'ঠিক করলাম তোমার আগেই চলে আসব এখানে। তোমাদের প্রতিটা পদক্ষেপের ওপর নজর রাখব। আমি যে এখানে আসছি সেটা জানিয়ে মিস্টার পেইশার ঘরে একটা মেসেজ রেখে আসি। ব্যাগপাইপ দিয়ে সঙ্কেত দেয়ার বুদ্ধিটাও আমারই। মিস্টার পেইশার রুমে আমাকেই তুমি ব্যাগপাইপ প্র্যাকটিস করতে শুনেছ।'

কিশোর ফিরল কিমের দিকে। 'আপনার গেইলিক কোড মেসেজের অনেকটাই অনুমান করে ফেলেছি আমরা। পুরোটা কি হবে?'

পেইশা জানাল, ওই মেসেজে চোরের দলের ট্রাক রুটের কথা লেখা ছিল। লেখা ছিল গভীর একটা খাদের পাশ দিয়ে এগোতে হবে। ভেড়া বহনকারী ট্রাকের পেছনের খাঁচার দরজা শুধু বন্ধ করলেই চলবে না, তালা লাগিয়ে দিতে হবে। লোম আর চামড়া নিয়ে গিয়ে হাউসবোটে রেখে ডামবারটনে পাচারের নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে।

কিশোর বলল মেসেজে আঁকা সবগুলো ছবিরই মানে বুঝতে পেরেছে ও, কেবল দোলনার মত জিনিসটার পারেনি। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল পেইশা ও কিম। জবাব দিল না। ওদের উদ্দেশে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারল কিশোর, 'আপনাদের কোনজনের স্ত্রীর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে?'

আবারও চোখাচোখি করল দুই চোর। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকাল কিম। 'আমার। ওকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আকারে উচ্চতায় তোমার সমান। চেহারায়ও সামান্য মিল আছে। তোমার পত্রিকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ওর চুল কেটে প্লাস্টিকের নাক লাগিয়ে, গালের ভেতর রবারের প্যাড পুরে দিয়ে ছেলে সাজিয়ে ফেললাম। বছর কয়েক আগে কালজীন দুর্গে গিয়েছিল ও। নৌকার মত দেখতে একটা দোলনা দেখেছিল ওখানে। আমাদের ছেলেটা যখন হলো, তাকে শোয়ানোর জন্যে ঠিক ওই রকম দোলনা বানিয়েছিল সে। পেইশা সেটা দেখেছে। ওই দোলনা এঁকে ওকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছি আমার স্ত্রী এসে গেছে।'

'মানুষ বটে আপনি!' ঘৃণায় নাক কুঁচকাল কিশোর। 'আপনাদের অপরাদের জগতে স্ত্রীকেও টেনে এনেছেন। তারমানে তাকে দিয়েই আমার সই জাল করিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন? ওষুধের দোকান থেকে তাকেই ফোন করে জানিয়েছিলেন আমার অটোগ্রাফ পেয়ে যাওয়ার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল কিম। জেরার মুখে স্বীকার করল 'উইদাউট স্ট্যাম্প' কথাটা লিখে তার স্ত্রীর কথাই বোঝাতে চেয়েছে। ওদের দলের সব চোরের হাতেই একটা বিশেষ চিহ্ন উল্কি দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে, পরস্পরকে চেনার জন্যে। নেই কেবল ওই মহিলার হাতে। উইদাউট স্ট্যাম্প–তারমানে 'ছাপহীন'। এই জালিয়াতিটা শুধু পেইশা আর কিমের ব্যক্তিগত গোপন পরিকল্পনা। দলের আর কাউকে জানানো হয়নি ভাগ দেয়া লাগবে বলে।

রহস্যের সমাধান করার জন্যে পুলিশ অফিসাররা ভূয়সী প্রশংসা করল তিন গোয়েন্দার।

কিশোর বলল, 'আরও একজন কিন্তু আমাদের সাহায্য করেছে। রকি বীচে পল কিমের মুখোশ সে-ই খুলে দিয়েছে। সে আমাদের বন্ধু।'

হাসল মুসা। 'তার নাম টমাস মার্টিন।'

'তাকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো,' সুপারিনটেডেন্ট বললেন। কিশোরের দিকে ফিরলেন, 'আসামীদের আর কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস মিস্টার কিম এবং সঙ্গীরা বোধহয় জানে লেডি ওয়াগনারের বাড়ি থেকে একটা মূল্যবান ব্রোচ চুরি গেছে। জানতে চাই সেটা কোথায়?'

প্রথমে মুখ খুলতে চাইল না আসামীদের কেউ। সুপারিনটেনডেন্টের কড়া ধমক খেয়ে শেষে পেইশা স্বীকার করল, 'লেডি ওয়াগনারের পরিচারিকা ক্যারি তার এক বন্ধুকে বলেছিল, তার মনিব, মিসেস মারিয়া পাশা নামে তাঁর এক ভাগ্নীকে পোখরাজ বসানো একটা হিরের ব্রোচ উপহার দেবেন। ব্রোচের কথা আমি ক্যারির বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। সিদ্ধান্ত নেই আমি আর কিম মিলে ওটা চুরি করব। বিক্রি করে যে টাকা পাব, ভাগাভাগি করে নেব দু'জনে।'

'বাপরে বাপ, কি লোভ! যা দেখে সবই খেতে চায়!' পেইশার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'ব্রোচটা এখন কোথায়?'

'লেডি ওয়াগনারের পুকুরের তলায়,' জবাব দিল পেইশা। কিভাবে ওখানে গেল ওটা, তা-ও স্বীকার করল সে। ব্রোচ চুরি করতে গিয়ে লেডি ওয়াগনারের কুকুরের তাড়া খায় সে। আরেকটু হলেই ওটা তাকে কামড়ে দিত। ভেড়া অজ্ঞান করার স্প্রে গানটা সঙ্গেই ছিল তার। উপায় না দেখে স্প্রে করে দেয় কুকুরটার ওপর। বেশি ওষুধ ছিটানো হয়ে গিয়েছিল। কুকুরটা ছটফট করে মরে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে।

পেইশা জানাল, ঠিক ওই সময় সে দেখে লেডি ওয়াগনার বাগানে বেড়াতে এসেছেন। তার পোশাকের সঙ্গে আটকানো রয়েছে বহুমূল্য ব্রোচটা। ওটা কিভাবে হাতানো যায় ভাবছে সে, এ সময় কাকতালীয় ঘটনা ঘটল। বোধহয় ঠিকমত

লাগানো হয়নি, লেডি ওয়াগনারের পোশাক থেকে ওটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

'উনি ঘরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমি,' পেইশা বলল। 'তারপর তুলে নিই ব্রোচটা। হঠাৎ একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনে দৌড় মারি। কপাল যেদিন খারাপ হয় অঘটন ঘটতেই থাকে। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করতে গেলে যা হয়। কিসের সঙ্গে যেন পা বেঁধে পড়ে যাই। ব্রোচটা হাত থেকে ফস্কে পানিতে পড়ে যায়। এক রাতে ওই বাড়িতে আবার হানা দিই ব্রোচটা উদ্ধারের আশায়। কিন্তু ওবাড়ির দু'জন কর্মচারী ওদিকে হাঁটাহাঁটি করছিল বলে ছেড়ে দিই ব্রোচ উদ্ধারের আশা। কিম আর আমি ঠিক করেছিলাম কিশোররা স্কটল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই আবার হানা দেব ওবাড়িতে।'

সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়ে গেছে।

প্রাসাদে ফিরে এল গোয়েন্দারা। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে সবার মুখ।

লেডি ওয়াগনার জানতে চাইলেন কি হয়েছে। সর্বশেষ খবর শুনে তিনিও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিন গোয়েন্দো তাড়াতাড়ি সাঁতারের পোশাক পরে ফেলল। তারপর চলল পুকুরের দিকে। ক্যারি আর হেনরিও ওদের সঙ্গী হলো।

বার বার পুকুরে ডুব দিতে থাকল ওরা। পুকুরের তলা খুঁজল তন্নতন্ন করে। জিনিসটা খুঁজে পেল শেষে মুসা। পানির নিচে পুকুরের তলায় জলজ আগাছার মধ্যে কিছু একটা চকচক করতে দেখল সে।

আগাছা সরিয়ে হাতে নিল ওটা। উঠে এল ওপরে।

পোখরাজ আর হীরে বসানো সেই ব্রোচ!

হাত নেড়ে সবাইকে দেখাল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন লেডি ওয়াগনার। 'সত্যি সত্যি পেলে তাহলে! ওহ্ কি যে খুশি লাগছে আমার! আহারে, কত কষ্ট করতে হয়েছে তোমাদেরকে এজন্যে।'

পুকুর পাড়ে উঠে এল মুসা। ব্রোচটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আপনার হাসি দেখে আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেছে। নিন।' বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কি বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সবাই।

লেডি ওয়াগনার হাসলেন। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'ওহহো, তোমাকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি। আজ তোমার চাচা আসছে এখানে। আমার ভাগ্নী জামাই।'

শুনে খুশি হলো কিশোর।

বিকেলে টমকে ফোন করল সে। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানাল। 'তোমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই ফোনটা করলাম। তোমার জন্মদিনে যোগ দিতে পারব আমরা। ঠিক সময়েই ফিরে আসব।'

ফোন ছেড়ে দিল কিশোর। পাশেই দাঁড়ানো ছিল মুসা আর রবিন।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'যাক, ভালয় ভালয়ই শেষ হলো সব। কানমলা, নাকে খত, আর কোনদিন যদি আমাদের কারও ছবি পত্রিকায় দিয়েছি।

উফ্, কি ঝামেলাটাই না গেল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'গোয়েন্দাদের কখনও পত্রিকায় ছবি দিতে নেই। তাহলে অপরাধী ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে।'

'তবে এবার ওই ছবির কল্যাণে অনেক সহায়তাও পেয়েছি আমরা,' কিশোর বলল। 'পথে পথে লোকজন কি সাহায্যটাই না করল।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' বলে উঠল মুসা। 'আমি আরেকবার মিসেস কারগুনারের বাড়িতে যাবই, যা-ই বলো আর না বলো। যা রান্না! উফ্!'

'পরিবেশটাও দুর্দান্ত,' স্বীকার করল কিশোর। 'আসলেই যাওয়া দরকার। ও বাড়িতে থেকে আরেকবার রাতের দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারছি না আমিও।' এরিনার দিকে তাকাল সে। 'এরিনা, এতই যখন করলে, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।'

'তা তো যাবই,' হাসল এরিনা। 'তোমাদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে না? কথা দিতে পারি, মিসেস কারগুনারের বাড়ির মত ভাল রান্না হবে না ওখানে, তবে খুব একটা খারাপও হবে না। ওখানকার প্রকৃতিও তোমাকে মোহিত করবে।'

'আসলে স্কটল্যান্ড দেশটাই ভারী সুন্দর,' কিশোর বলল। 'আর সুন্দর এখানকার মানুষগুলোর মন। সুযোগ পেলেই আবার আমি চলে আসব এখানে।'

'সাথে করে আবার কোন রহস্য নিয়ে এসো কিন্তু,' হাসল এরিনা। 'আর দয়া করে আমাকে খবর দিয়ো তোমার সহকারী হওয়ার জন্যে।'

হাসল মুসা। 'কিশোর, মাঝে মাঝে সত্যি তোমাকে বড় ঈর্ষা হয়। সারা দুনিয়ার সবাই যেন তোমার সহকারী হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, কোনমতে একবার মিশলেই খালি হয়।'

'সেটা কি আমার দোষ?'

'উঁহু, গুণ,' হাসিমুখে জবাবটা দিয়ে দিলেন লেডি ওয়াগনার। হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন, 'মেরি যে কেন তোর জন্যে এত পাগল, তোকে না দেখলে বুঝতাম না।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে কিশোরকে জড়িয়ে ধরলেন লেডি ওয়াগানার। টুক করে চুমু খেয়ে বসলেন গালে। 'আজ থেকে আমি তোর সত্যিকারের নানী। স্কটল্যান্ডে এলে আমার সঙ্গে যদি দেখা করে না যাস, কান ধরে গিয়ে আমেরিকা থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব। এখানে আমার ক্ষমতা তো দেখেই গেলি। পারব যে সেটা বুঝিস?'

***